বাংলাপিডিএফ
ঝিন্দের রানী
দস্যু দুহিতা
দস্যু বনহুর
১১-১২
দুই খন্ড একত্রে
রোমেনা আফাজ
রনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

ঝিন্দের রাণী-১১
দস্যু দুহিতা-১২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মঙ্গলসিন্ধ কারাগারে বাস করলেও বাইরের সব খবর তার নিকটে পৌঁছত। রাজার কয়েকজন দুষ্ট অনুচর ছিল, তারা গোপনে সব কথা জানাত কুমার বাহাদুরের নিকটে। একদিন কয়েকজন দুষ্ট অনুচরের সহায়তায় কারাগারের পাহারাদারকে হত্যা করে কারাগার থেকে বেরিয়ে এল মঙ্গলসিন্ধ। এখন মঙ্গলসিন্ধের পায়ের জখম সম্পূর্ণ সেরে গেছে। কারণ, রাজকুমার কারাগারে বাস করলেও তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি।

মঙ্গলসিন্ধের প্রধান সহচর কঙ্কর সিং যেমন নির্দয় তেমনি নীচুমনা।

মঙ্গলসিন্ধ বন্ধুর কাছে এমন এক পরামর্শ পেল যা তার মনে এনে দিল প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালা।

সেদিন রাজা জয়সিন্ধ নিজের কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। সারাটা দিন তিনি প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং প্রজাদের যতটুকু উপকার করতে পারেন তার কোন ত্রুটি করতেন না। তাঁর ন্যায়বিচারে প্রজাগণ সব সময় তুষ্ট ছিল।

গভীর রাতে মঙ্গলসিন্ধ কারাগার থেকে বেরিয়ে এল। হস্তে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, অতি গোপনে পিতার কক্ষে প্রবেশ করল সে। কঙ্কর সিং দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

মঙ্গলসিন্ধ পিতার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দু'চোখে তার অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে মঙ্গলসিন্ধ দক্ষিণ হাতে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

মঙ্গলসিন্ধ একবার তীব্র কটাক্ষে পিতার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর অতি দ্রুতহস্তে ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিল রাজা জয়সিন্ধের বুকে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলেন রাজা জয়সিন্ধ, তারপর নীরব হয়ে গেল সব।

কেউ জানল না, কেউ দেখল না, কে রাজাকে হত্যা করল পরদিন রাজ্যময় কথাটা ছড়িয়ে পড়ল পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ পেল ন্যায়বিচারক রাজা জয়সিন্ধের নির্মম হত্যা রহস্যের কথা।

সমস্ত রাজ্যে একটা গভীর শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। প্রজাগণ এবং দেশবাসী হাহাকার করে উঠল, আজ থেকে তাদের ন্যায়দণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

কথাটা নিজের বজরায় বসে শুনল দস্যু বনহুর।

দক্ষিণ হাত তার মুষ্ঠিবদ্ধ হল, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল দাঁতে দাঁত পিষে বলল— রাজা জয়সিন্ধের খুন আমার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রহমান।

বনহুরের সামনে দণ্ডায়মান ছিল রহমান, বলল সে— এমন মহৎ সদাশয় রাজাকে কে হত্যা করল?

সে প্রশ্ন আমাকেও উত্তেজিত করে তুলছে রহমান। ভেবেছিলাম অচিরেই আমরা ঝিন্দা শহর ত্যাগ করে চলে যাব কিন্তু তা হল না।

সর্দার, আবার এখানে--

হাঁ, রহমান যতদিন আমি রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে না পেরেছি ততদিন আমার ঝিন্দ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তুমি তো জান রহমান, দস্যু বনহুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জান কোরবান করতেও দ্বিধা বোধ করে না। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, আজ রাতেই আমরা বের হব, দেখতে চাই কে এই রাজা জয়সিন্ধের মৃত্যুদূত।

কথাগুলো বলার সময় বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বজরার মেঝেতে পায়চারী কবতে লাগলো সে।

রহমান বনহুরের উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে ভীত হল। সর্দারকে সে এমনভাবে রাগতে খুব কমই দেখেছে। রহমান ভয়ঙ্কর একটা কিছুর প্রতীক্ষা করতে লাগল, তবু বলল— সর্দার, ঝিন্দের রাজার মৃত্যু ঘটেছে তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কি দরকার?

রহমান, বনহুর শুধু যে দেশে জন্মেছে সে দেশের সন্তান নয়। সারা বিশ্ব তার জন্মস্থান। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার আপনজন। ন্যায় তার রীতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার সংগ্রাম, এর কোনদিন পরিবর্তন হবে না।

বনহুরের এ কথার পর রহমান আর কিছু বলতে পারল না। সর্দারকে সে ভালভাবে জানে, সে একবার যা বলবে তা না করে ছাড়বে না।

সে বুঝতে পারল জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে সর্দার খুঁজে বের করবেই এবং জয়সিন্ধের হত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই।

❑

সেদিন মনিরা আর সুফিয়া শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল। এখন তাদের একসঙ্গেই উঠা-বসা, নাওয়া-খাওয়া এমনকি ওরা দু'জন এক সঙ্গে একই কক্ষে, একই বিছানায় শোয়।

নানা সুখ-দুঃখের গল্প করে, হাঁসে কাঁদে, কত রকম কথাবার্তাই না হয় মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে।

সেদিন কথায় কথায় বলে মনিরা—সত্যিই বোন সুফিয়া, আজ আমরা মহৎ হৃদয় বিনয় বাবুর জন্যই রক্ষা পেয়েছি, তাঁর এ উপকারের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। আজও তিনি আমাদের যে উপকার করে চলেছেন তা আর বলার নয়। তাঁর মত মহান লোক এ দুনিয়ায় খুবই কম আছেন।

মনিরার কথায় বলে উঠল সুফিয়া— ঠিকই বলেছ মনিরা, তাঁর সুন্দর চেহারার সঙ্গে মনের অদ্ভুত মিল আছে। এমন সুন্দর সুপুরুষ আর বুঝি হয় না।

হাঁ সুফিয়া, একদিন তিনি সুন্দর সুপুরুষই ছিল হয়তো, যদিও তিনি আজ বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু—

মনিরার কথা শেষ হয় না, সুফিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল— বৃদ্ধ-কাকে তুমি বৃদ্ধ বলছ মনিরা'?

কেন বিনয় বাবুর কথা বলছি, তিনি সত্যি এককালে সুন্দর সুপুরুষ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এসব কি বলছ মনিরা। কাকে তুমি বৃদ্ধ বলছ'?

মনিরা একটু হকচকিয়ে যায়, অবাক কণ্ঠে বলে— হাসছ যে বড়?

তোমার কথাশুনে না হেসে পারছি না মনিরা— বিনয় বাবুকে তুমি বৃদ্ধ বললে কি করে?

মনিরা বিব্রত কণ্ঠে বলল— তিনি একেবারে বৃদ্ধ না হলেও— প্রৌঢ় তো—

আবার হাসল সুফিয়া, তারপর বলল, তুমি কার কথা বলছ মনিরা, আমি বুঝতে পারছি না।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো— আমাদের উদ্ধারকর্তা বিনয় বাবুর কথা বলছি।

আশ্চর্য। তিনি তো যুবক, বৃদ্ধ দেখলে কখন?

তিনি যুবক!

হাঁ, তিনি সুন্দর সুপুরুষ যুবক।

মনিরা অন্যমনস্কভাবে অস্ফুট কণ্ঠে বলল—তবে যে— কথা শেষ না করে কিছু ভাবতে লাগল মনিরা, এসব কি শুনছে সে। বিনয় সেন তাহলে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে, তবে কে সে?

গভীর রাত। সুফিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে?

মনিরার চোখে ঘুম নেই। কত কথাই না তার মনে উদয় হচ্ছে। পিতা-মাতা, মামা-মামীমা, স্বামী. শিশুপুত্র নূরের কথা— একটার পর একটা স্মৃতি ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে তার মানসপটে। মনিরার মনের ব্যথা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বালিশে। তারপর সব কথা মুছে নতুন করে একটা কথা আলোড়ন জাগাল তার বুকের মধ্যে। বিনয় বাবু তাকে বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল পিশাচিনী হেমাঙ্গিনীর নিকট হতে। কিন্তু কোনদিন তার প্রতি কোন অসৎ আচরণ করেনি। বরং আজ বিনয় বাবুর মহত্ত্বের জন্যই সে নতুন জীবন লাভ করেছে। কিন্তু সুফিয়ার নিকটে আজ যে কথা সে শুনল তা অতি বিস্ময়কর। বিনয় বাবু বৃদ্ধ নন—যুবক, অতি সুন্দর সুপুরুষ -- এ সব কি তবে সত্যি কথা? বিনয় সেনের তার নিকট বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কি?

হঠাৎ মনিরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল, নদীতীরে অশ্বপদশব্দে চমকে উঠল মনিরা, তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে বজরার জানালায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না মনিরা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও কিছুই নজরে পড়ল না, অশ্বপদশব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরান্তে।

মনিরা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

মঙ্গলসিন্ধের বাগানবাড়িতে আবার আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে। নাচেগানে ভরপুর হয়ে উঠেছে বাগানবাড়ি। মঙ্গলসিন্ধ এখন স্বাধীন, তাকে বাঁধা দেবার বা তার কাজে আপত্তি জানাবার কেউ নেই।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মঙ্গলসিন্ধ কিছুটা শোকের ভান করেছিল, প্রজাদের ডেকে দুঃখ জানিয়ে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কেঁদেছিল। সেদিনও বিনয় সেন দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। মঙ্গলসিন্ধের চোখের পানি তার অন্তরেও ব্যথার সৃষ্টি করেছিল। মঙ্গলসিন্ধের কান্নায় প্রজাদের মনেও কষ্ট হয়েছিল অনেক। কঙ্করসিং বন্ধুর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল—সবদিন কি কারও পিতা-মাতা জীবিত থাকে? কি হবে দুঃখ করে—এখন রাজ্য ভার গ্রহণ করে—প্রজাদের দুঃখভার লাঘব কর।

বিনয় সেন বলেছিল সেদিন— হাঁ কুমার বাহাদুর, কঙ্কর সিং ঠিকই বলেছেন, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করে রাজকার্য শুরু করুন।

অন্যান্য রাজকর্মচারী নীরব ছিলেন, কারণ তারা সবাই জানেন মঙ্গলসিন্ধ কেমন লোক। রাজকার্যভার সে গ্রহণ করলে দেশের ও দশের কি অবস্থা দাঁড়াবে। মঙ্গলসিন্ধের আচরণে ভেতরে ভেতরে সবাই অসন্তুষ্ট ছিল। রাজকুমারের ব্যবহারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলসিন্ধ যখন পিতার শোকে মুহ্যমান হয়ে বার বার রুমালে চোখ মুছিল, তখন রাজকর্মচারিগণ বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন। মঙ্গলসিন্ধের এ কান্না যে নিছক একটা ভণ্ডামি এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। রাজার জীবিতকালে সে যথেচ্ছাচরণে প্রায়ই বাধা পেত। অনেক সময় পিতার নিকটে তিরস্কার শুনতে হত। এমনকি রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অনেকবার ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। এহেন পিতার মৃত্যুতে পুত্রের চোখের পানি যে একটা অহেতুক লোক দেখান কারসাজি, এটা অনেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছিলেন।

কিন্তু লোকে যতই যা ভাবুক বা মনে করুক রাজার মৃত্যু ঘটেছে, কাজেই রাজার প্রয়োজন। একমাত্র পুত্র মঙ্গলসিন্ধ ছাড়া রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই।

মঙ্গলসিন্ধ রাজা হল।

মঙ্গলসিন্ধ রাজা হয়ে প্রথমেই বুড়ো মন্ত্রী কৃষ্ণ সেনকে রাজকার্য থেকে বহিস্কার করল। সে আসনে প্রতিষ্ঠা করল বন্ধু কঙ্কর সিংকে। আর বিনয় সেনকে করল তার প্রধান সহকারি।

বিনয় সেন মঙ্গলসিন্ধের এই আন্তরিকতায় খুশি হল।

মঙ্গলসিন্ধের রাজকার্যে বিনয় সেন যথেষ্ট সহায়তা করে চলল।

আর কঙ্কর সিং করে চলল ঠিক তার উল্টো, রাজকার্যে মঙ্গলসিন্ধকে সব সময় কুপরামর্শ দিতে লাগল। যতদূর সম্ভব কঙ্কর সিং নিজেও প্রজাদের ওপর চালাল নানা অত্যাচার আর উৎপীড়ন।

সেদিন মঙ্গলসিন্ধ নিজের বিশ্রামকক্ষে বসেছিল। আজকাল মদ পান তার বেড়ে গেছে। বাগানবাড়িতেও আজকাল প্রতিদিন বাঈজী নাচ চলছে। কঙ্কর সিং আর বিনয় সেনের সঙ্গে মঙ্গলসিন্ধের আলাপ আলোচনা হচ্ছিল।

কঙ্কর সিং বলল— কুমার, একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।

মঙ্গলসিন্ধ মদের শূন্যপাত্রটা নামিয়ে রেখে বলল— দুঃসংবাদ। না, দুঃসংবাদ শুনতে আমি রাজী নই বন্ধু।

বিনয় সেন আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল শঙ্কর সিংয়ের মুখের দিকে তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল— কোন রাজকার্যঘটিত দুঃসংবাদ না কি?

কঙ্কর সিং বলে উঠল— রাজকার্যঘটিত দুঃসংবাদ হলে তাতে তেমন ঘাবড়াবার কিছু ছিল না। এটা তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ।

এবার মঙ্গলসিন্ধের টনক নড়ল, বলল—তবে কিসের দুঃসংবাদ কঙ্কর?

হেমাঙ্গিনী নিহত হয়েছে। হয়েছে--

হেমাঙ্গিনী নিহত হয়েছে। বল কি বন্ধু?

শুধু হেমাঙ্গিনীই নিহত হয়নি, তার আস্তানা পুলিশের দখলে চলে গেছে—

এও কি সম্ভব?

অসম্ভব কিছুই নয় কুমার, হেমাঙ্গিনীকে পুলিশ হত্যা করে তার আস্তানা দখল করে নিয়েছে, তার সহকারীদের বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করেছে।

আর তার মাল?

তাদের পুলিশের হেফাজতে যার যার পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনের নিকটে পাঠান হয়েছে।

বল কি কঙ্কর, এত বড় ঘটনা কবে ঘটল?

সে আজ বেশ কিছুদিন হল, তুমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলে--

মঙ্গলসিন্ধ চিৎকার করে উঠল— আমাকে জানাওনি কেন?

তুমি এমনিই বিমর্ষ এবং চিন্তাযুক্ত ছিলে তাই।

তুমি একথা আমাকে না জানিয়ে ভুল করেছ কঙ্কর। হেমাঙ্গিনীকে পুলিশ হত্যা করে আমার বুকের পাঁজর গুঁড়া করে দিয়েছে। আমি পুলিশদের সমুচিত শাস্তি দেব।

বিনয় সেন মৃদু হেসে বলল— আর আপনার পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি দেবেন না কুমার বাহাদুর?

মঙ্গলসিন্ধ কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠল কঙ্কর সিং— মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছিলেন, অচিরেই তাঁর মৃত্যু ঘটত— সেক্ষেত্রে তাঁকে হত্যা করে হত্যাকারী তেমন কোন ক্ষতি করেনি।

বিনয় সেন কঙ্কর সিংয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকাল মঙ্গলসিন্ধের দিকে।

মঙ্গলসিন্ধ তখন বোতল থেকে শূন্যপাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে গলাধঃকরণ করল তারপর জড়িত কণ্ঠে বলল— বুড়োমানুষগুলো দুনিয়ার আবর্জনার মত জঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা গেছে, তার অদৃষ্ট তাকে সরিয়ে নিয়েছে। তাকে কে হত্যা করল বা করেছে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তাছাড়া পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি— হাঃ হাঃ হাঃ—বিনয় সেন আপনি— না না, থাক আজ নয়, পরে— আরও পরে সব বলব, কিন্তু—

কঙ্কর সিং মঙ্গলসিন্ধের পিঠে থাবা দিয়ে বলে উঠল— কিন্তু আর নয়, চুপ কর।

হাঁ চুপ করলাম, কিন্তু হেমাঙ্গিনী ছাড়া আমার মনে কে শান্তি এনে দেবে বন্ধু?

বিনয় সেন হেসে বলল— এজন্য দুঃখ করে কি হবে। শ্রী কঙ্কর সিং থাকতে অমন হেমাঙ্গিনীর চেয়ে আরও কত হেমাঙ্গিনী রয়েছে শহরে, খুঁজে বের করবেন উনি।

কঙ্কর সিং বিনয় সেনের কথায় খুশি হল, বলল সে— হাঁ কুমার, বিনয় সেন যা বলেছে অতি সত্য, এক হেমাঙ্গিনী গেছে আরও কত হেমাঙ্গিনী সৃষ্টি হবে যারা নিত্যনতুন মাল তোমাকে পরিবেশন করবে।

কিন্তু আমি যে বড় হাঁপিয়ে পড়েছি কঙ্কর। মঙ্গলসিন্ধের গলায় অসহায় ভাব।

বিনয় সেন বলে উঠল—বাঈজীদের নাচ কি আপনার মনে শান্তি এনে দেয় না কুমার বাহাদুর।

না বিনয় সেন, বাঈজীদের নীরস নাচ আর গান আমার মনে কোন আনন্দ দেয় না, আমি চাই নিত্য নতুন ফুল— কথা শেষ করে হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল মঙ্গলসিন্ধ-—

কঙ্কর সিং বলে উঠল—হতাশ হবার কিছু নেই, আজই আমি নতুন একটা আমদানি করব। কুমার বাহাদুর কত টাকা দেবে বল?

যত খুশি চাও দেব। বন্ধু, এখন আমি রাজা মঙ্গলসিন্ধ, কুমার নই— বুঝেছ? টাকার জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই।

চমৎকার! এই তো কথার মতো কথা, দাও পাঁচ হাজার। হাত পাতলো কঙ্কর সিং।

মঙ্গলসিন্ধ বিনয় সেনকে বলল— কোষাধ্যক্ষকে বলে দিন। কঙ্করকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিতে।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল, বলল— আচ্ছা।

❑

বাগানবাড়ি।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং বসে আছে, সামনে মদের বোতল। অদূরে বসে বিনয় সেন। একটা নতুন মেয়ে নাচছিল, চোখেমুখে ভীতি ভাব। তবু নাচছে কম্পিত চরণ তুলে।

বার বার করতালিতে মুখর হয়ে উঠছিল কক্ষটা।

হঠাৎ কঙ্কর সিং উঠে দাঁড়াো ইংগিত করল।

মঙ্গলসিন্ধ উঠে কঙ্কর সিংকে অনুসরণ করল।

দু'জন কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো, তারপর বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল মঙ্গল সিন্ধ— আপনি এখন যেতে পারেন।

বিনয় সেনের ভালও লাগছিল না, উঠে দাঁড়াল চলে বাবার পূর্বে একবার নতুন নর্তকীর দিকে তাকিয়ে দেখল।

দুটো অসহায় দৃষ্টির সংগে বিনয় সেনের দৃষ্টির বিনিয়ম হল।

বিনয় সেন বাগানবাড়ি ত্যাগ করল।

অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে বিনয় সেন, হঠাৎ তার সামনে একটা জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়াল অন্ধকারেও বিনয় সেন বুঝতে পারল মূর্তিটার হাতে একটা রিভলবার।

বিনয় সেন কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ থ, মেরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—কি চাও?

জমকালো মূর্তিটা চাপাকণ্ঠে বলল— যদি মঙ্গল চাও তবে শীঘ্র রাজ বাড়ি ত্যাগ করে চলে যাও---

বিনয় সেন স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—যদি না যাই?

মৃত্যু! তোমাকে মরতে হবে।

বিনয় সেন হাসল হাঃ হাঃ হাঃ, মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় বিনয় সেন। রাজকার্য পরিচালনায় কুমার বাহাদুরকে সে সাহায্য করবেই। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে জমকালো মূর্তির হাত থেকে রিভলবারখানা ফেলে দিল দূরে— তারপর চলল ধস্তাধস্তি। বেশিক্ষণ বিনয় সেনের সঙ্গে পেরে উঠল না জমকালো মূর্তি অন্ধকারে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচালো।

বিনয় সেন আর বিলম্ব না করে ফিরে গেল নিজ বজরায়।

পথে নানা চিন্তার জাল তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী কে, তবে কি তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধের চক্রান্তেই রাজা নিহত হয়েছেন? নাকি কঙ্কর সিংয়ের কাজ এটা। তাদের আচরণে যথেষ্ট সন্দেহের ছোঁয়া রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না সত্যিকার খুনীকে আবিষ্কার করতে পেরেছে বিনয় সেন ততক্ষণ তার মনে শান্তি নেই। যেমন করে হোক আসল খুনীকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। মহৎ রাজার হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কে এই জমকালো মূর্তি যে আজ তাকে রিভলবার দেখিয়ে রাজবাড়ি ত্যাগ করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল? কি এর অভিসন্ধি, আর কেনই বা তাকে সরে পরার জন্য এত তাগাদা---

বজরায় এসেও বিনয় সেনের মন থেকে এই চিন্তা দূর হল না। শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঐ সব নিয়েই ভাবছে বিনয় সেন। বয় এসে তাকে খাবার জন্য বলল।

বিনয় সেন বয়কে জিজ্ঞাসা করল—সুফিয়া আর মনিরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ স্যার, তাঁরা আর এতরাতে জেগে থাকতে পারেন, অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বিনয় সেন বলল— তুই যা, আমি আসছি।

বয় চলে গেল।

বিনয় সেন শয্যা ত্যাগ করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

গভীর চিন্তায় এতক্ষণ সে হাতমুখ ধোয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিল।

বাথরুমে প্রবেশ করে পরিষ্কার পানিতে হাতমুখ ধুয়ে ফেলল বিনয় সেন, ক্লান্তি আর অবসাদ অনেকটা দূর হল তার। বজরায় এখন মনিরা আর সুফিয়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু বিনয় সেনের ধারণা সত্য নয়। সুফিয়া ঘুমালেও মনিরা ঘুমাতে পারেনি এখনও। গত কয়েকদিন ধরে মনিরার মনে একটা কথা সর্বদা ঘুরপাক খাচ্ছিল, বিনয় সেন বৃদ্ধা বা প্রৌঢ় নন, তিনি সুন্দর সুপুরুষ বলেছিল সুফিয়া। এ কথাটাই অহরহ মনিরার মনে দ্বন্দ্ব জাগাচ্ছিল, কে এই বিনয় সেন? তার কাছে নিজেকে গোপন করাই বা কারণ কি? আজ মনিরা দেখতে চায় কে এই বিনয় সেন---মনিরা চোরের মত চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে একটা অনুভূতি তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। পা টিপে টিপে বজরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে অতি সন্তর্পণে বিনয় সেনের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল। গভীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে অসংখ্যা তারার মেলা। মৃদু বাতাস বইছে, বজরাখানা একটু একটু দোল খাচ্ছে।

মনিরা দরজার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়েছে। নিজেকে সংযত করে উঁকি দিল ভেতরে।

বজরার কক্ষ শূন্য। কেউ নেই, শয্যা শূন্য--- মনিরা ভীত হল, হঠাৎ যদি সুফিয়া জেগে উঠে তাকে বিছানায় না দেখে বেরিয়ে আসে--এখানে যদি দেখতে পায় কি ভাববে, ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ মনিরা দেখবে এই বিনয় সেন কে?

❑

মনিরা চমকে উঠল, কে যেন তাঁর কাঁধে হাত রেখেছে ফিরে তাকাতেই বিবর্ণ ফ্যাকাশে হল তার মুখমণ্ডল, বিনয় সেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল বিনয় সেন—এখানে কি দেখছ মনিরা?

মনিরা লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ কেন সে এভাবে এখানে এসেছিল। নিশ্চয়ই বিনয় সেন তাকে কিছু ভেবে বসেছেন। সুফিয়া তাকে জব্দ করার জন্যই হয়তো এ কথা বলেছে, না, না, সুফিয়ার কথায় বিশ্বাস করা তার ঠিক হয়নি।

বিনয় সেন মনিরাকে চিন্তা করতে দেখে বলল—গরমে বুঝি ঘুম হচ্ছে না তোমার?

মনিরা তার কথার কোন জবাব দিতে পারল না, বলল— আমায় কামরায় পৌছে দিন!

বিনয় সেন বলল— চল।

মনিরা নিজেদের কামরায় প্রবেশ করতেই দেখতে পায় সুফিয়া জেগে উঠেছে, মনিরাকে দেখে বলে—কোথায় গিয়েছিলে মনিরা?

বড্ড গরম বোধ করছিলাম— তাই একটু ---

জানি।

কি জান সুফিয়া?

তুমি বিনয় সেনের কক্ষে যাওনি?

সুফিয়া!

মিথ্যা কথা বলো না মনিরা, আমি সব জানি।

কি জান সুফিয়া?

জানি, তুমি বিনয় সেনকে ভালবেসে---

ছিঃ ছিঃ একথা ভাবতে পারলে সুফিয়া?

মনিরা, আমি লক্ষ্য করেছি আজ বেশ কিছুদিন হল তুমি অত্যন্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছ। সব সময় তুমি বিনয় সেনের জন্য --

সুফিয়া, আমি ভাবতেও পারিনি তোমার মনে এমন একটা ধারণা দানা বাঁধতে পারে। বিনয় সেন বৃদ্ধ, গুরুজন স্থানীয়-- তাকে আমি শ্রদ্ধা করি---

মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল তখন কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে ফেলল বিনয় সেন, একটা মৃদু হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

মন্থর গতিতে নিজের কামরায় চলে গেল বিনয় সেন।

এরপর থেকে বিনয় সেন লক্ষ্য করল মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে বেশ একটা মনোমালিন্য ভাব। দু'জন সব সময় দু'জনকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু এক বজরায় বাস করে এও কি সম্ভব? বিনয় সেন চিন্তিত হল।

একদিন বিনয় সেন সুফিয়াকে নির্জনে ডেকে বলল—সুফিয়া, একটা কথা তোমাকে বলব।

বলুন ভাইজান।

তোমাকে আমি বোনের মতই ভালবাসি----

আমি জানি ভাইজান।

সে কারণেই আজ আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

সুফিয়া তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে, কি বলতে চান বিনয় সেন। আজ সুফিয়া বিনয় সেনের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতির লহরী লক্ষ্য করল। সুফিয়া তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

বিনয় সেন বলল— সুফিয়া, আমি মনিরাকে ভালবেসে ফেলেছি।

জানিনা, কেন আমার ওকে এত ভাল লাগে।

সুফিয়া চমকে উঠল— তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে, পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করে নিল।

বিনয় সেন বলে চলেছে— সুফিয়া, তুমিই একমাত্র আমার এ বাসনা পূর্ণ করতে পার।

সুফিয়া এবার বলল— মনিরা সুন্দরী, ওকে ভাললাগা স্বাভাবিক, আপনার মনের কথা আমি তাকে বলব।

হাঁ সুফিয়া, তুমি যদি ওকে বুঝিয়ে কথাটা বল তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

বেশ, আমি বলব।

সুফিয়া জানত এরকম একটা ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে। সে মনিরাকে এক সময় সব কথা খুলে বলল।

মনিরা স্তব্ধ হয়ে শুনল, তার মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। সে ভেবেছিল বিনয় সেন কোনদিন তার প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করবে না। কিন্তু আজ তার মনের সে ধারণা নষ্ট হয়ে গেল। আশঙ্কায় বুকটা টিপ্ টিপ্ করে উঠল।

সুফিয়ার হাত মুঠায় চেপে ধরে বলল মনিরা— সুফিয়া, তাকে তুমি বলে দিও তাঁর উপকারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁর কথায় আমি রাজী নই। আমাকে যদি তিনি হত্যাও করেন— তবুও না।

সুফিয়া মনিরার কথাগুলো বলল বিনয় সেনকে— ভাইজান, মনিরাকে আমি কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। অতি কঠিন মেয়ে এই মনিরা।

বিনয় সেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল সে— সুফিয়া, তোমার মনের ভুল ভেঙেছে তো?

সুফিয়া কথাটা বুঝতে না পেরে বলল— আমার মনের ভুল, কি বলছেন ভাইজান?

সেদিন রাতে তুমি না মনিরাকে বলেছিলে সে আমার প্রতি আসক্তা---

সুফিয়া এবার বুঝতে পারল মনিরা আর তার মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল সব শুনেছেন বিনয় সেন। লজ্জিত হল সুফিয়া। সত্য সত্যই মনিরাকে সে একদিন সন্দেহ করেছিল। আজ সে সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

এরপর থেকে মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। একসঙ্গে উঠা-বসা ও শোয়া সব হতে লাগল।

বিনয় সেন খুশি হল।

আবার সে স্বচ্ছ মনে রাজা জয়সিন্ধের হত্যারহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করল।

❑

শিশু মনিকে নিয়ে নূরী দিনরাত ব্যস্ত থাকলেও সদাসর্বদা বনহুরের অভাব তার অন্তরে ব্যথার খোঁচা দিয়ে চলল। বনহুরই যে তার স্বপ্ন তার সাধনা। ওকে ছাড়া নূরী কোনদিন বাঁচতে পারে না। দিনের পর দিন কেটে চলল বনহুরের প্রতীক্ষায়, দিন গুণে নূরী। যখনই মনটা ওর অশান্তিতে ভরে উঠত তখনই শিশু মনিকে বুকে চেপে ধরত। একটা অনাবিল শান্তির ছোঁয়া তখন, তার হৃদয়কে শীতল করে দিত।

শিশু মনি এখন বেশ বড় হয়েছে। এক পা দু'পা করে হাঁটতে শিখেছে সে। ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে মুখে অস্ফুট শব্দ করে বাব্বা-- বাব্বা বা--

অমনি ছুটে এসে নূরী বুকে চেপে ধরত মনিকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিত মুখখানা, বলত কোথায়—তোমার বাবা? কে তোমার বাবা মনি?

মনি দু'হাতে নূরীর গলা জড়িয়ে ধরে ফিক ফিক করে হেসে ফেলত। ফোকলা মুখে অপূর্ব সে হাসির ছটা।

নূরী প্রতিদিন শিশু মনিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। ঝর্ণার ধারে বসে গান গাইত। চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকত— আয় আয় চাঁদ মামা, মনির কপালে টিপ দিয়ে যা। সোনার কপালে টিপ দিয়ে যা। কখনও বা দোলনায় শুইয়ে দোলা দিত আর গুনগুন করে গান গাইতো যে গান সে বনহুরের পাশে বসে কত দিন তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাইত। সে গান নূরী সব সময় গায়। মনে পড়ে বনহুরের কথা। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর না থাকায় যদিও নরীর তেমন কোন কষ্ট হয় না, আস্তানায় এখন বহু অনুচর রয়েছে যারা সদা সর্বদা নূরী এবং শিশুটির সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখেছে।

নূর যখন ঘুমায় নূরী তখন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে; সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় শিশুমুখে তার বনহুরের প্রতিচ্ছবি। নূরী অবাক হয়ে ভাবে এ কেমন করে সম্ভব হল। তার হুরের চেহারার সঙ্গে এ শিশুর চেহারার এতটা মিল কি করে সম্ভব হল!

কিন্তু যতই নূরী শিশুটাকে দেখত ততই আরও আকৃষ্ট হত আরও গভীরভাবে ভালবাসত, স্নেহ করত। এক মুহূর্ত নূরী শিশুটিকে চোখের আড়াল করতে পারত না।

একদিন শিশু মনিকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে নূরী, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নরাজ্যে চলে যায় সে। দেখতে পায় গহন একটা বনের মধ্যে সে বনহুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কত কাঁটা বিধেছে তার পায়ে, কত আঘাত পেয়েছে শরীরে তবু আকুলভাবে খুঁজছে সে তার হুরকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। হঠাৎ বন আলো করে একটা আলোর ছটা ফুটে উঠল। একি, নূরী অবাক হয়ে দেখল--- সেই আলোর বন্যার মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার হুর আর একটি যুবতী। একি, এ যে সেই মেয়ে—যাকে সে একদিন কান্দাই বনের পোড়াবাড়িতে হুরের বাহুবন্ধনে দেখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল, ছুটে গিয়ে পুলিশের নিকটে বনহুরের সন্ধান দিয়েছিল। এ যে সেই মেয়ে----ওকি, ওদের মধ্যে একটা

শিশু দাঁড়িয়ে, ছোট্ট শিশু এ যে তার মনি! মনি ওদের পাশে----নূরী ছুটে গিয়ে মনিকে বুকে তুলে নিল---- সঙ্গে সঙ্গে নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি পাশে শোয়া মনিকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। মনের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। একি স্বপ্ন দেখল সে তার হুরের মনিই পাশে ঐ মেয়েটিকে আজ আবার নতুন করে দেখল। আর বা কেন তাদের পাশে?

নূরী যতই চিন্তা করতে লাগল— ততই একটা অসহ্য জ্বালা মনটাকে তার আচ্ছন্ন করে ফেলল।

গোটারাত তার ঘুম হল না।

সেদিন নূরীর মনে স্বপ্নটা একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। সব সময় ঐ স্বপ্নের দৃশ্যটা ওর চোখে ভেসে বেড়াতে লাগল। নূরী কিছুতেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারল না, বনহুরের অনুচর গহর আলীকে বলল— গহর আলী, তুমি যাবার আয়োজন কর আমি ঝিন্দ শহরে যাব।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল গহর আলী— ঝিন্দ শহরেই তো সর্দার গেছেন। হাঁ, সে কারণেই আমি যাব গহর, তুমি আমার যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে দাও।

তা কি করে সম্ভব বল, সর্দার নিশ্চয়ই সেখানে তোমাকে দেখে খুশি হবেন না।

না গহর, আমি আর তার জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি না। আমি যাবই।

এদিকে কে সামলাবে?

আমি সব ব্যবস্থা করে যাব। নাজির হোসেন আছে, ফরহাদ আছে, আরও অনেক অনুচর আছে, সবাই হুরের আস্তানা সামলাবে— আমি না থাকলেও ক্ষতি হবে না।

বেশ আমি আয়োজন করব। কিন্তু কে কে তোমার সঙ্গে যাবে নূরী?

তুমি এবং আরও সাতজন আমার সঙ্গে থাকবে।

আচ্ছা, আমি যাত্রার আয়োজন করছি।

এদিকে মনিকে নিয়ে নূরী যখন ঝিন্দে যাবার আয়োজন করছে তখন ঝিন্দে বনহুর রাজা জয়সিন্ধের হত্যারহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত। রহমানও সব সময় তার পাশে পাশে রয়েছে ছায়ার মত।

গভীর রাতে গোটা বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দস্যু বনহুর রহমান সহ বেরিয়ে পড়ে। বনহুর তার অশ্ব তাজের পিঠে আর রহমান তার অশ্ব দুলকির পিঠে।

শরীরে তাদের জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, হাতে গুলিভরা রিভলবার।

শহরের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে দুটি অশ্ব—দস্যু বনহুর আর রহমান। নির্জন পথ, দু'ধারে বাড়িগুলো যেন সজাগ প্রহারীর মত দন্ডায়মান রয়েছে। কোন—কোন বাড়ির মুক্ত গবাক্ষে ডিমলাইটের অনুজ্জ্বল ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে।

দূর হতে ভেসে আসছে বেওয়ারিশ কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ।

দস্যু বনহুর আর রহমান আরও কিছুক্ষণ চলার পর শহরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অদূরে বিরাট একটা টিলা, টিলার উপর একখানা রাজ প্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ হলেও কালের নির্মম আঘাতে প্রাসাদটার আজ জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। রাজা সূর্যসেনের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যা সিন্ধিরাণীর অন্তর্ধানের পর বাড়িটা একেবারে পোড়োবাড়ির মত হয়ে গেছে। বহুদিন বাড়িটার কোন যত্ন নেয়া হয়নি। কাজেই সব ভেঙে খসে পড়েছে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলল— রহমান, সামনে যে প্রাসাদ দেখছ এটাই সূর্যসেনের বাড়ি।

সর্দার, এ বাড়িতে আমাদের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে বৈকি! তুমি আমার সঙ্গে এসো। আর একটু অগ্রসর হবার পর আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কারণ অশ্বপদশব্দ আমাদের কার্যে ব্যঘাত ঘটাতে পারে।

রহমান সর্দারের কথার অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলেও আর কোন প্রশ্ন করল না। সে সর্দারকে অনুসরণ করতে লাগল।

নিঝুম রাতি।

টিলার নিকট পৌঁছে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলাল সূর্যসেনের বাড়িখানার দিকে।

বাড়িখানার নিকটবর্তী হতেই বনহুর আর রহমানের কানে ভেসে এলো একটা তীব্র আর্তনাদ— কাউকে যেন কশাঘাত করা হচ্ছে বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছে। আর্তনাদটা পুরুষ কণ্ঠের।

রহমান অন্ধকারে একবার তাকাল বনহুরের মুখের দিকে। তার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল—এ বাড়িখানার মধ্যে কে এমনভাবে তীব্র আর্তনাদ করছে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে অগ্রসর হলো। দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রিভলবার। রহমানের হাতেও রিভলবার।

বাড়িটার ঠিক পেছন প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান।

এখনও সেই আর্তনাদ থেমে থেমে শুনা যাচ্ছে।

বনহুর বলল— রহমান, সতর্কতার সঙ্গে প্রাচীর টপকে অন্দর মহলে যেতে হবে।

রহমান আর নিশ্চুপ থাকতে পারল না, বলল— সর্দার, এই বাড়িতে আপনার আগমনের অর্থ কি এখনও আমি বুঝতে পারলাম না।

বনহুর বলল— গত কয়েকদিন হলো ঝিন্দের পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায় নিখোঁজ হয়েছেন, নিশ্চয়ই শুনেছ?

হাঁ, শুনেছিলাম। তিনি নাকি পুলিশ অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে উধাও হয়েছেন। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও তাঁকে পায়নি।

রহমান, আমার মনে হয় এই যে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছ এটা ধনঞ্জয় রায়ের কণ্ঠস্বর। আমি তাঁরই সন্ধানে এখানে এসেছি। রহমান, তুমি প্রাচীর টপকে ওপারে যাও, আমিও যাচ্ছি।

অল্পক্ষণেই বনহুর আর রহমান রাজা সূর্যসেনের রাজ-অন্তপুরে প্রবেশ করল।

বহুদিন বাড়িখানায় লোকজনের বাস না থাকায় বাড়িটা একরকম পোড়োবাড়ির মতই নির্জন হয়ে পড়েছে। বাড়ির কোথাও আলো নেই। গাঢ় অন্ধকার সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর আর রহমান অতি লঘু পদক্ষেপে এগুলো। এখনও সেই আর্তনাদ থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণাদায়ক করুণ আর্তনাদ।

বনহুর রহমানসহ এগিয়ে চলল যেদিক থেকে শব্দটা আসছে। বিরাট বিরাট কক্ষের টানা বারান্দা বেয়ে বনহুর আর রহমান এগুচ্ছিল। সম্মুখের একটি কক্ষে আলো জ্বলছে, নজরে পড়ল তাদের। বনহুর আর রহমান সেই কক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুক্ত জানালায় উঁকি দিয়ে কক্ষে কেউ আছে কিনা দেখে নিল বনহুর–না, কেউ নেই----

কক্ষটা নির্জন, কিন্তু কক্ষে যে কেউ বাস করে এটা বেশ বুঝতে পারল সে।

বনহুর আর রহমান সেই কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছিল। বনহুর আর রহমান কক্ষে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। কক্ষটার একপাশে একটা খাট রয়েছে, খাটের উপরে বিছানায় একটি কম্বল আর একটি তেলচিটে বালিশ। খাটের চারপাশে ধূলো এত পুরু হয়ে পড়েছে যে খাটের রঙ বুঝার কোন উপায় নেই। একটা পায়াভাংগা টেবিল এপাশের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলে কয়েকটা সিগারেটের খালি বাক্স এবং ম্যাচের ঠোসা। মদের দুটো খালি বোতল, একটা কাঁচের গ্লাস।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেল দেয়ালে, কয়েকখানা তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে দেখতে পেল। ছবিগুলোর গায়ে যদিও ধূলা-বালি লেগে একেবারে রঙ পাল্টে গেছে বা ছবির চেহারা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবু বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তৈল চিএগুলো নিশ্চয় রাজা সূর্যসেনের বংশধরগণের। হঠাৎ একটা ছবির ওপর দৃষ্টি পড়তেই বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল, নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে।

সর্দারকে এভাবে ছবির দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে রহমান আশ্চর্য হলো। শুধু তাই নয়, রহমান অবাক হয়ে দেখল তার সর্দারের দুচোখে অশ্রু ভরে উঠেছে। ছবিখানা একটি যুবতীর তৈলচিত্র।

রহমান জিজ্ঞেস করল—সর্দার, এ চিত্রখানা কার?

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—রাজা সূর্য সৈনের কন্যা সিন্ধীরাণীর।

সে এখন কোথায় সর্দার?

বেঁচে নেই! একটু থেমে পুনরায় বলল বনহুর–এই সিন্ধীরাণী একদিন আমাকে সাগরতলে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে আবার শোনা যায় সে করুণ তীব্র আর্তনাদ–আঃ আঃ আঃ উঃ উঃ....

বনহুর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রহমানসহ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে দ্রুত এগুলো।

কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে একটা চোরাকুঠরির মত কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান। সেই কক্ষ হতেই করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

বনহুর আর রহমান দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকাল কক্ষের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলল বনহুর—যা ভেবেছিলাম তাই। পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

বনহুরের পাশ কেটে উঁকি দিল রহমান। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অর্ধ বয়স্ক এক ভদ্রলোককে দুহাতে শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পা দু'খানা মাটি থেকে আধা হাত উপরে রয়েছে। একজন ভয়ঙ্কর চেরাহার লোক শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক দিয়ে আঘাত করছে ভদ্রলোকের দেহে। ভদ্রলোকের সারা শরীর বেয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অস্ফুট আর্তনাদ করছেন ভদ্রলোক। দুজন লোক দাঁড়িয়ে, শরীরে তাদের রাজকীয় পোশাক।

বনহুর বলল–রহমান, ওদের চিনতে পেরেছ যারা দাঁড়িয়ে আছে?

হ্যাঁ সর্দার, একজন রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ, অন্যজন কঙ্কর সিং।

ঠিকই ধরেছ, ওদের চক্রান্তেই ধনঞ্জয় নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং তাঁকে এখানে আটকে রেখে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ রহমান?

হ্যাঁ করেছি, ধনঞ্জয়ের সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

শুধু তাই নয়, অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দুটো লৌহশলাকা লক্ষ্য করেছ?

হ্যাঁ সর্দার।

ঐ লৌহশলাকা দুটি ধনঞ্জয় রায়ের চোখে প্রবেশ করান হবে...

কি নির্মম..

তার পূর্বেই ধনঞ্জয় রায়কে উদ্ধার করে নিতে হবে।

ঐ দেখুন সর্দার, এবার লোকটা লৌহশলাকা দুটি হাতে তুলে নিচ্ছে।

আর বিলম্ব নয়, এসো আমার সঙ্গে–কথা শেষ করেই বনহুর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল, তারপর একসঙ্গে বনহুর আর রহমান গুলিভরা উদ্যত রিভলবার হাতে কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর রিভলবার ঠিক রেখে প্রচণ্ড এক পদাঘাতে লোকটার হাত থেকে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দুটি দূরে নিক্ষেপ করল। নিরস্ত্র মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং একপাশে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ জন্তুর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছে।

রহমান মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিংহের বুক লক্ষ্য করে রিভলবার উঁচু করে ধরল।

যে লোকটা এতক্ষণ চাবুক দ্বারা ধনঞ্জয় রায়কে আঘাত করছিল, বনহুর তার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। বনহুর নিজ হাতে পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের হাতের শিকল মুক্ত করে তাঁকে নামিয়ে নিল। আঘাতে জর্জরিত ধনঞ্জয় রায় চাবুকের নির্মম কশাঘাতে মৃত্যুপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তিনি জ্ঞান হারাননি। তিনি যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ঠিক তখন হঠাৎ জমকালো পোশাক পরা দু'জন অদ্ভুত মানুষের আবির্ভাব এবং তাদের কার্যকলাপ তাঁকে অবাক করে তুলল। তারপর যখন জমকালো পোশাক পরা লোক দুটি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিল, তখন আরও অবাক হলেন ধনঞ্জয় রায়। জমকালো মূর্তিদ্বয়ের মুখ তাদের মাথার কাল পাগড়ীর আঁচল দিয়ে বাঁধা ছিল, তাই তাদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

বনহুর ধনঞ্জয় রায়কে শূন্য থেকে নামিয়ে নিয়ে কাঁধে তুলে নিল, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল।

রহমান তখনও মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের বুকের কাছে রিভলবার উদ্যত করে ধরে আছে।

যতক্ষণ না বনহুর তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে ধনঞ্জয় রায়কে উঠিয়ে নিল ততক্ষণ রহমান মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিংয়ের নিকট থেকে সরে যায় নি।

বনহুর ধনঞ্জয় রায়কে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে নিজেও উঠে বসল।

রহমান তখন রিভলবার ঠিক রেখে পিছু হটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর তাকে কে পায়, সেও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিজের অশ্বের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তারপর ছুটে চলল রহমান দুলকির পিঠে।

❑

বনহুর আর রহমান ধনঞ্জয় রায়কে নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌছল। ধনঞ্জয় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লেন, নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে জমকালো

মূর্তিদ্বয়কে বললেন—জানি না আপনারা কে— কি উদ্দেশ্যেই বা আপনারা আমাকে এই সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। যদিও আপনারা আমার অজানা বন্ধু তবু এটুকু জিজ্ঞেস করি, আপনারা কে বা কি নাম আপনাদের দু'জনের?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল দস্যু বনহুর—অত্যাচারীর দমন, আর বিপদকারীর উদ্ধার সাধন এই দুটোই আমাদের কাজ। আমার নাম দস্যু বনহুর আর এর নাম রহমান—আমার সহকারী।

পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ ইন্সপেক্টার। কিন্তু আমি আপনাদের দেশে অতিথি, দস্যু নই।

ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন দস্যু বনহুরের মুখের দিকে। দস্যু বনহুরের নাম তাঁর অজানা নয়। সারা পৃথিবীতে এই নাম সুপরিচিত, কাজেই ধনঞ্জয় রায় এ নামের সঙ্গে পরিচিত হবেন তাতে সন্দেহ কি?

বনহুর এবার মৃদু হাসল, যদিও কাল পাগড়ীর আঁচলে তার মুখের নিচের অংশটুকু ঢাকা তবু তার কথা বুঝা গেল, পাওয়া গেল তার হাসির আওয়াজ, বললে বনহুর–ভয় নেই ইন্সপেক্টার, আপনার কোন অমঙ্গল আমি করব না। কথা শেষ করে সে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল।

রহমান আর দস্যু বনহুর যখন নিজ বজরায় এসে পৌঁছল তখন পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল।

রহমান অনুসরণ করল সর্দারকে।

দু'জন অনুচর তাজ আর দুলকিকে নিয়ে গহন বনের দিকে চলে গেল।

বনহুর বজরার নিকটবর্তী হতেই রহমান বলল—সর্দার, আমি এবার চলি?

বনহুর অন্যমনস্কভাবে বজরার দিকে এগুচ্ছিল, রহমানের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল—তোমাদের পানসী নৌকা কোথায় রেখেছ রহমান?

ঐ বড় নদীর বাঁকে, যেখানে বনটা ঘন হয়ে নদীর মধ্যে নেমে গেছে সেখানে।

তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না সর্দার, আমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না।

তোমরা এতগুলো লোক একসঙ্গে থাক...

পানসীখানা খুব বড় কিনা, ঝিন্দ দেশের পানসী নৌকা.... আপনি তো জানেন।

বেশ যাও। শোনো রহমান–

রহমান চলে যাচ্ছিল, সর্দারের ডাকে ধমকে দাঁড়ায়।

বনহুর দু'পা এগিয়ে আসে, তারপর বলে—পুলিশরা বড় বেঈমান হয়। ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয়ের মনোভাব ভাল মনে হলা না—আচ্ছা যাও তুমি।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে নদীর তীর বেয়ে অগ্রসর হল।

বনহুর এগুলো তার বজরার দিকে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় গা এগিয়ে দিল, ঝিন্দ শহর তার অচিরেই ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু কেন যেন সে দিন দিন ঝিন্দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। কিছু পূর্বে পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের কথা স্মরণ হলো, আর একটু বিলম্ব হলে বেচারার জীবনটা চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যেত, দু'চোখ অন্ধ হত তাঁর।

মনে পড়ল শয়তান মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের কথা। ইচ্ছে করল ওদের দু'জনকেও কীটের মত আজ হত্যা করতে পারত সে। কিন্তু ওদের হত্যা করলে অহেতুক নরহত্যা করা হবে। তাছাড়া রাজা জয়সিন্ধের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। কাজেই বনহুর নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে নিয়েছিল তখন।

আরও একটা কাজ এখনও বনহুরের মনে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে তা হচ্ছে রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী কে, মঙ্গলসিন্ধ না অন্য কেউ।

যদি মঙ্গলসিন্ধই রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী হয় তবে বনহুর কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করবে না কঙ্কর সিংকেও, যদি মঙ্গলসিন্ধকে তার পিতা-হত্যায় উৎসাহিত করে থাকে বা সাহায্য করে থাকে।

বনহুর নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই তার।

❑

মঙ্গলসিন্ধকে আজ অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে। রাজকার্যে তার যেন মন বসছে না। কঙ্করসিংয়ের মনোভাবে বেশ চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিনয় সেন শুধু শান্ত ধীরস্থির, গম্ভীরভাবে তার নিজ আসনে বসেছিল।

মঙ্গলসিন্ধ রাজকার্য অতি সংক্ষেপে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। কঙ্করসিংকে লক্ষ্য করে বলল—বিনয় সেন সহ আমার বিশ্রামাগারে এস, কথা আছে।

মঙ্গলসিন্ধ রাজসভা করে নিজ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করল। কঙ্করসিং এবং বিনয় সেন অনুসরণ করল তাকে।

মঙ্গলসিন্ধ আসন গ্রহণ করার পর কঙ্করসিং ও বিনয় সেন আসন গ্রহণ করল।

মঙ্গলসিন্ধ সম্মুখস্থ পা-দানিতে প্রচণ্ড একটা পদাঘাত করে কঠিন কণ্ঠে বলল—আমার রাজ্যে কে এবং কারা এমন দুঃসাহসী আছে যারা আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়?

কঙ্কর সিং বলে উঠল—হ্যাঁ, এত সাহস কাদের, কাদের বুকের পাটা এত বড়?

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মুখের দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করল—কুমার বাহাদুর, আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মঙ্গলসিন্ধ এবার শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল—সে কথা বলব বলেই আপনাকে ডেকেছি বিনয় সেন। একটা এমন কথা যা না বললেও নয়,. অথচ অতি গোপনীয়।

বলুন কুমার বাহাদুর? বললো বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ সোজা হয়ে বসলো দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, বললো-বিনয় সেন, আপনি জানেন পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে হেমাঙ্গিনী হত্যার অপরাধে আমি আমার গুপ্ত অনুচর দ্বারা বন্দী করি।

হ্যাঁ, এ কথা আমি জানি কুমার বাহাদুর, আরও জানি তাকে রাজা সূর্যসেনের পোড়ো রাজ প্রাসাদের চোরাকুঠরিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

হয়েছিল, তার উপযুক্ত সাজাও দেয়া হচ্ছিল, কিন্তু কাল রাতে দুজন কাল পোশাক পরা লোক আচমকা সেখানে উপস্থিত হয় এবং আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দী পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে মুক্ত করে নিয়ে উধাও হয়।

বিনয় সেনের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠল, বলল সে—এ আপনি কি বলছেন কুমার বাহাদুর। ধনঞ্জয় রায়কে নিয়ে উধাও হয়েছে, কে তারা এমন দুঃসাহসী......

বিনয় সেন আপনি এই মুহূর্তে আমার রাজ্যে গোপনে গুপ্তচর নিযুক্ত করে দিন। কে বা কারা এমন দুঃসাহসী আছে যারা আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

কঙ্কর সিংও মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলল–হ্যাঁ, এই দুষ্ট লোক দুটিকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে এবং তাদের পাকড়াও করে এনে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুদ্বয় এবং জিহ্বা ছেদন করা হবে।

বিনয় সেনের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, বলল সে–অত্যাচারীদের শাস্তি শুধু জিহ্বা ছেদন ও চক্ষুদ্বয়ে লৌহশলাকা প্রবেশ নয়, তাদের শাস্তি শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেলে লবণ মাখিয়ে দেয়া।

মঙ্গলসিন্ধ বিনয় সেনের কথায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল—বিনয় সেন, আপনি পারবেন এদের দুজনকে খুঁজে বের করতে এবং উপযুক্ত শাস্তি দান করতে। আজই আপনি গুপ্ত অনুচর দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, যেন শীঘ্র তারা দুশমনদের খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়।

কঙ্কর সিং বলে উঠল—আমি স্বহস্তে তাদের শরীরের চামড়া খুলে তবে ছাড়বো---দাঁতে দাঁত পিষে সে তার মনোভাব প্রকাশ করল।

বিনয় সেন তাকল তার মুখের দিকে।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, বিনয় সেন কাজের লোক, নিশ্চয়ই শয়তানদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। আপনি যেতে পারেন এবার।

বিনয় সেন মঙ্গলসিন্ধকে অভিবাদন করে কক্ষ ত্যাগ করল।

মঙ্গলসিন্ধ এবার কঙ্কর সিংয়ের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—নতুন খোরাকের আশায় মনটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে কঙ্কর। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু আমার বুকের পাঁজর চূর্ণ করে দিয়েছে। বেচারী কত সুন্দর মেয়েই না আমদানি করত।

কঙ্কর সিং মুচকি হেসে বলল—মঙ্গল, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি কয়েকজন লোক নিযুক্ত করেছি। অচিরেই তারা আমাদের মনমত নারী সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু আর কত দিন এমনি কাটবে বন্ধু। চল আজ আমরা নৌকা বিহারে যাই।

হ্যাঁ, তাই কর মঙ্গল, অনেকদিন নৌকা বিহারে যাওয়া হয়নি।

❑

মনিরার মনটা আজ কেমন ছটফট করছে। কিছু ভাল লাগছে না। এমনি আর কত দিন কাটবে, কোনদিন কি তার স্বামীর মন থেকে অবিশ্বাসের কালোছায়া মুছে যাবে না। চিরদিনই কি এমনিভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে?

সুফিয়া এমন সময় এলো তার নিকটে, হেসে বলল–কি ভাবছ মনিরা? আজ কিন্তু তোমাকে খুব বিষণ্ন মলিন দেখাচ্ছে—কি দুঃখ তোমার বলনা?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—দুঃখই যার জীবনের সাথী তার আবার নতুন কি দুঃখ থাকতে পারে সুফিয়া। তুমি তো আমার সব কথা জান।

জানি কিন্তু আজ হঠাৎ আবার এতটা---

কি জানি সুফিয়া, আজ মনের মধ্যে বড় অশান্তি বোধ করছি। আমার জীবনে যখনই কোন অশান্তির ঘনঘটা এগিয়ে আসে, তার পূর্বে আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়ে। জানি না আরও কি দুর্ভোগ এগিয়ে আসছে আমার জন্য।

ছিঃ মনিরা, মিছামিছি অশান্তির কালোছায়া মনে স্থান দিয়ে নিজেকে এত বিমর্ষ করছ। বিনয় ভাইজান বলেছেন–ঝিন্দে তাঁর কাজ শেষ হলেই আমাদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। তিনি আমাদের কত যত্নে রেখেছেন, এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা নেই আমাদের, বল সত্যি কি না?

হ্যাঁ সুফিয়া, বিনয় বাবুর দয়ায় আমাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট নেই। তিনি সত্যি বড় মহৎ হৃদয়, উন্নত প্রাণ। তাঁর ঋণ আমরা জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।

তবে কেন এত মন খারাপ কর? মনিরা, তোমার চেয়ে আমার ব্যথা কম নয়।

মনিরা মৃদু হাসল, বলল সে— সুফিয়া, তোমার ব্যথার চেয়ে আমার ব্যথা অনেক বেশি, তুমি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ছেড়ে অশান্তি ভোগ করছ, আর আমি....একটু থেমে বলল মনিরা–আর আমার এ দুনিয়ায় কেউ নেই, কিছু নেই, আমি সর্বহারা–চাপা কান্নায় কণ্ঠ ধরে আসে তার।

সুফিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বলে উঠল–দেখ দেখ মনিরা, একখানা নৌকা এদিকে আসছে।

মনিরা তাকাল, দেখতে পেল একটা নৌকা তাদের বজরার দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েকজন লোকও আছে দেখা যাচ্ছে।

মনিরা বলল—কোন শিকারীদল হবে।

সুফিয়া বলল—আমার মনে হচ্ছে ওরা কোন সওদাগর, দেখছ না নৌকাখানা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।

মনিরা তখনও তাকিয়ে আছে বজরার সামনে পাটাতনে দাঁড়িয়ে, সুফিয়া বলল—ভেতরে চলো মনিরা।

নৌকাখানা তখন আরও অনেক এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ সুফিয়া অস্ফুট স্বরে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠল—মনিরা, ঐ যে লোকটা দাড়িয়ে আছে ওকে যেন আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই বলে ওঠে সে—চলে এস মনিরা, চলে এস, ওকে চিনতে পেরেছি, ও বড় শয়তান লোক। ওর কবল থেকেই বিনয় ভাইজান আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন।

মনিরা আর সুফিয়া দ্রুত বজরার মধ্যে প্রবেশ করল।

কিন্তু ততক্ষণে নৌকাখানা অতি নিকটে পৌঁছে গেছে। নৌকাখানা রাজা মঙ্গলসিন্ধের। নৌকায় মঙ্গলসিন্ধ, কঙ্করসিং এবং আরও দু'তিন জন তার সঙ্গী রয়েছে। কঙ্কর সিংয়ের পরামর্শেই মঙ্গলসিন্ধ নৌকাভ্রমণে এদিকে এসেছে। কারণ এটা ঝিন্দ শহরের একেবারে নির্জন বনাঞ্চল, এদিকে সহজে লোকজন বড় আসে না, কঙ্করসিং বলেছিল, যেদিকে লোকজন কম বা নির্জন সেদিকে আজ যাব; বনের ধারে নদীতীরে অনেক সময় হরিণ জলপান করতে আসে, নৌকাভ্রমণও হবে, শিকার করাও হবে। মঙ্গলসিন্ধ কঙ্করসিংয়ের কথামতই মাঝিগণকে এদিকে নৌকা আনতে বলেছিল।

নৌকা নিয়ে মনের আনন্দে চারদিক দর্শন করতে করতে আসছিল তারা। জনহীন নিস্তব্ধ নদীবক্ষ বেয়ে তাদের নৌকা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ তারা দেখতে পায় অদূরে একটা বজরা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে আশ্চর্য হয় মঙ্গলসিন্ধ, এই নির্জন নদীবক্ষে বজরা এল কোথা থেকে। পরক্ষণে আরও আশ্চর্য হয় যখন তাদের নজরে পড়ে বজরায় দুটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংয়ের কথামত মাঝিগণ নৌকার গতি বাড়িয়ে দেয়।

মনিরা আর সুফিয়া তাড়াতাড়ি সরে পড়লেও দুষ্ট মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংয়ের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। মনিরার অপূর্ব সুন্দর চেহারা মঙ্গলসিন্ধের মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

নৌকা অল্পক্ষণেই বজরার কিনারে এসে ভিড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয় সেনের দুজন অনুচর যারা বজরা রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিলো তারা এগিয়ে এল, একজন বলল—আপনারা কি চান?

নৌকা থেকে কঙ্করসিং প্রথমে উত্তর করল—এটা রাজা মঙ্গলসিন্ধের পানসী নৌকা। জানতে চাই তোমরা কে এবং কি কারণে এই নির্জন স্থানে অবস্থান করছ?

রাইফেলধারী পাহারাদাররা জবাব দিল—আমরা বিদেশী শিকারী, এখানে এসেছি বন্য পশু শিকার করবো বলে।

তোমরা শিকারী, মিথ্যে কথা। তোমাদের বজরায় কে আছে বল? বলল কঙ্কর সিং।

পাহারাদার বলল—আমাদের মনিব শিকারে গেছেন, নৌকায় কেউ নেই।

এবার মঙ্গলসিন্ধ হুঙ্কার ছাড়ল—কঙ্কর, এদের গ্রেফতার কর আমি বজরাখানা তল্লাশি করব।

সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কর এবং আরও দু'জন দুষ্ট লোক বজরায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কঙ্কর সিং তার রাইফেলের প্রচণ্ড আঘাতে একজন পাহারাদারকে ধরাশায়ী করল। দ্বিতীয় পাহারাদার আক্রমণ করল কঙ্করসিংকে। ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হল। ততক্ষণ বজরার মাঝিগণ যে যা পেল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল।

মঙ্গলসিন্ধ তার রাইফেলের গুলিতে একে একে মাঝিদের হত্যা করল। তখনও দ্বিতীয় পাহারাদার আর কঙ্করসিংয়ের লড়াই চলছে, সে কিছুতেই মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংকে বজরার প্রবেশ করতে দেবে না।

ওদিকে সুফিয়া তখন তীরবিদ্ধ হরিণীর মত কাঁপছে।

মনিরা ওর দিকে তাকিয়ে নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল। বলল—ভয় কি সুফিয়া, মরতে হয় বীর রমণীর মত মরব, তবু নিজের ইজ্জত হারাবো না।

সুফিয়া কম্পিত গলায় বলল—আমি যে বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছি মনিরা, ঐ শয়তানের কবল থেকে একবার রক্ষা পেয়েছি আর বুঝি নিজেকে বাঁচাতে পারব না।

তাহলে তুমি বিছানার নিচে লুকিয়ে পড়। যা অদৃষ্টে থাকে আমার হবে।

মনিরা কথা শেষ করে বিছানার নিচে সুফিয়াকে লুকিয়ে রাখল। যেমনি মনিরা সুফিয়াকে লুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঠিক সেই মুহূর্তে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল মঙ্গলসিন্ধ। দু'চোখে তার লালসা ভরা।

মঙ্গলসিন্ধ মনিরাকে দেখামাত্র ভুলে গেল সব, ভুলে গেল দ্বিতীয় কোন নারীর কথা। বিমুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে তাকাল মনিরার দিকে। জীবনে সে বহু নারী দেখেছে কিন্তু এত সুন্দরী নারী সে কোনদিন দেখেনি। মনিরার অপূর্ব রূপ মঙ্গলসিন্ধের মনে এক অদ্ভুত মোহের সৃষ্টি করল।

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাগর ডাগর চোখ দুটি মঙ্গলসিন্ধের মুখে সীমাবদ্ধ। অদ্ভুত এক দৃষ্টি মনিরার দু'চোখে ঝরে পড়ছে।

মঙ্গলসিন্ধ এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় কঙ্কর সিং দ্বিতীয় পাহারাদারকেও ঘায়েল করে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল। মনিরাকে দেখতে পেয়ে সেও অবাক হল, তারপর দ্রুত এগুতে গেল তার দিকে, মঙ্গলসিন্ধ হাত বাড়িয়ে পথ রোধ করল—দাঁড়াও।

কঙ্করসিং বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল মঙ্গলসিন্ধের দিকে, তারপর বলল—স্বর্গের অপ্সরী।

হ্যাঁ কঙ্কর, স্বর্গের অপ্সরী বলেই মনে হচ্ছে—বললো মঙ্গল সিন্ধ।

কঙ্কর সিং এবার তাদের অনুচরগণকে ডাকল। পথ মুক্ত, বজরার পাহারাদারগণ কেউ বা আহত কেউ বা নিহত হয়েছে। কাজেই তারা আর কোন বাধাই পেল না, নির্বিঘ্নে বজরার কক্ষে প্রবেশ করে মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের সম্মুখে দাঁড়াল।

কঙ্কর সিং বলল–তোমরা ওকে জোরপূর্বক আমাদের নৌকায় উঠিয়ে নাও।

তৎক্ষণাৎ দু'জন গুণ্ডাধরনের লোক ক্ষিপ্তের ন্যায় এগুলো মনিরার দিকে, আর একটু হলেই মনিরাকে তারা ধরে ফেলবে।

সুফিয়ার কথায় এবং একটু পূর্বে নৌকার আরোহীদের কথায় মনিরা বুঝতে পেরেছিল ওটা রাজা মঙ্গলসিন্ধের নৌকা এবং এ যুবকই যে রাজা মঙ্গলসিন্ধ এটাও সে অনুমানে ধরে নিয়েছিল, কারণ তার শরীরে রাজকীয় পোশাক ছিল। মনিরা আরও জানে বিনয় সেন রাজা মঙ্গলসিন্ধের রাজদরবারে চাকরি করে—এদের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এরা সংখ্যায় অনেক বেশি— কাজেই তার নারীশক্তি এদের কাছে কিছু নয়। মনিরা বুদ্ধির কৌশলে নিজেকে রক্ষা করার উপায় করে নিল।

লোকগুলো এগিয়ে আসতেই মনিরা বলল—তোমরা আমাকে স্পর্শ কর না, আমি তোমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায়ই যাব।

লোক দু'জন তবু এগুচ্ছিল, কঙ্কর সিং বলল—ওর কথায় বিশ্বাস করনা, নিশ্চয়ই ও পালাবার ফন্দি করছে। তোমরা ওকে ধরে হাত-পা বেঁধে নৌকায় উঠিয়ে নাও।

মঙ্গলসিন্ধ আজ কঙ্কর সিংয়ের কথায় কান না দিয়ে বললো—থাম, ও নিজে যখন আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে তখন ওকে তোমরা ধর না। তারপর মঙ্গলসিন্ধ নিজেই এগিয়ে এল মনিরার সম্মুখে—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা কেন এখানে এলাম বা এসেছি। কাজেই তোমার কোন আপত্তি আমরা শুনব না, চল আমাদের নৌকায়।

মনিরা সকলের অলক্ষ্যে একবার তার বিছানার দিকে তাকাল, মনে মনে বলল বিদায় সুফিয়া— বিদায়....

মনিরাকে নিয়ে মঙ্গলসিন্ধের নৌকা যখন নদীর বাঁকে অদৃশ্য হল তখন সুফিয়া আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। চারদিকে মৃতদেহ ছড়ান, বজরার পাটাতন রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে সুফিয়ার অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে উঠল।

বজরার চারজন মাঝি, পাহারাদার, দু'জন বাবুর্চি সবাই নিহত হয়েছে। একজন পাহারাদার শুধু জীবিত ছিল, কঙ্কর সিং মনে করেছিল তার আঘাতে সেও মরে গেছে। যদিও তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু সে নিশ্চুপ মৃতের ন্যায় পড়ে থেকে পাপিষ্ঠ শয়তানের কার্যকলাপ দেখছিল। যাতে মালিক এলে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারে।

সুফিয়ার অবস্থাও তাই, যদিও সে বিছানার তলায় আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করে নিয়েছিল, কিন্তু মনিরাকে যখন দুষ্টের দল নিয়ে গেল তখন সে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিল। বিনয় সেনকে বলে অন্ততঃ একটা কোন ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

এক্ষণে চারদিকে ছড়ানো মৃতদেহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুফিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল। মনিরাকে পেয়ে শয়তানগণ তার কথা ভুলে গিয়েছিল, নইলে ওরা যখন প্রথমে কথা বলেছিল তখন তাদের কথায় সুফিয়া স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল, এ বজরায় দুটি নারী রয়েছে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল, মনিরা যদি তাকে এভাবে শয্যার নিচে লুকিয়ে না রাখত তাহলে তাকেও ওরা পাকড়াও করে নিয়ে যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে পাহারাদারটি তখনও জীবিত ছিল তার নাম আসলাম। আসলাম অন্যান্য মৃতদেহের মধ্য হতে উঠে দাঁড়াল। সুফিয়াকে আকুলভাবে কাঁদতে দেখে বলল—আপনি এভাবে কাঁদবেন না। মালিক এলে নিশ্চয়ই তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন!

বিনয় সেন যখন তার বজরায় ফিরে এলো তখন বেলাশেষের সূর্যাস্তের ক্ষীণ রশ্মি এসে লালে লাল করে তুলছে তার বজরার প্রাঙ্গণ। চারদিকে মৃতদেহ আর জমাট রক্তে বজরাখানা ভয়াবহ হয়ে উঠছে। !

❑

বিনয় সেনকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো আসলাম আর সুফিয়া—কেঁদে কেঁদে সব কথা বলল তারা বিনয় সেনের নিকটে।

আসলাম বলল—মালিক, আমাকে আপনি হত্যা করুন। আমি বড় অপদার্থ। আমার চোখের সামনে সবাইকে নিহত করে ওরা তাকে নিয়ে পালাল অথচ আমি তাদের বাধা দিতে সক্ষম হলাম না, এর চেয়ে দুঃখ আর বেদনা কি হতে পারে মালিক!

বিনয় সেনের চোখেমুখে তখন প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আসলামের কথায় কান না দিয়ে বলল সে—সুফিয়া, সত্যই তুমি তাকে চিনতে পেরেছ যে একদিন তোমাকে সেই বাগানবাড়িতে.....

হাঁ ভাইজান, আমি তাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছি। কোনদিন তার চেহারা ভুলব না। শয়তান পাপিষ্ঠ রাজকুমার সে।

বিনয় সেন চারদিকে ছড়ানো লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল। এমন যে একটা ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে যাবে ভাবতেও পারেনি বিনয় সেন। নিরীহ মাঝি আর পাহারাদারদের মৃত্যু তার অন্তরে প্রচন্ড আঘাত করল আর সবচেয়ে বড় মনঃকষ্ট হল তার মনিরার জন্য। শয়তান মঙ্গলসিন্ধ না জানি তার ওপর কি অকথ্য ব্যবহার করছে।

বিনয় সেন ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করতে লাগল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বজরার মৃতদেহের ওপর ঝাপসা অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

বিনয় সেন বলল—সুফিয়া, এর প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়বো না। তার চোখ দুটো সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

❑

মঙ্গলসিন্ধ অন্যান্য নারীর মত মনিরার প্রতি জঘন্য আচরণ করতে পারল না। কেন যেন মনিরার চোখের দিকে তাকিয়ে শয়তান মঙ্গলসিন্ধের মনেও দ্বিধা এলো। নিজের রাজবাড়ির এক কক্ষে মনিরাকে আবদ্ধ করে রাখল সে।

কঙ্কর সিংয়ের ইচ্ছা মনিরাকে বাগানবাড়িতে আনা হোক কিন্তু মঙ্গল-সিন্ধ চায় না এই যুবতীকে তার লালসার সামগ্রী করে। মনিরাকে মঙ্গলসিন্ধের বড় ভাল লেগেছে, ওকে সে চিরদিনের জন্য পাশে পেতে চায়। সে কারণেই অন্যান্য যুবতীর মত মঙ্গলসিন্ধ মনিরাকে ব্যবহার করতে পারল না।

মনিরাকে বন্দী করে রাখলেও তার প্রতি কোন মন্দ আচরণ করা হল না। সুন্দর সুসজ্জিত একটা কক্ষে তাকে আটকে রাখা হল। তার সেবা-যত্নের জন্য কয়েকজন দাসী নিযুক্ত করে দিল মঙ্গলসিন্ধ। বন্দিনী যাতে কোন রকম কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখল সে।

মনিরা নিজের বুদ্ধিবলেই মঙ্গলসিন্ধের হিংস্র থাবা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলল। সে জানত এখানে সে কত অসহায়। মঙ্গলসিন্ধের কাছে সে একটি হীন পুতুলের মতই নির্জীব। কারণ সে এখন বন্দিনী।

মনিরাকে যখন মঙ্গলসিন্ধ নৌকায় এনে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি সেচ্ছায় এলে, কারণ কি যুবতী?

জবাবে বলেছিল মনিরা—যার দুনিয়ায় কেউ নেই তার আবার যেতে আপত্তি কি? ঐ বজরার মালিকও আমাকে বন্দী করে আটকে রেখেছিল, সুযোগ পেলেই এ দেশ ছেড়ে পালাবে, কাজেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে সহজেই রাজী হয়েছি।

মনিরার কথায় মঙ্গলসিন্ধের মনে অভূতপূর্ব একটা আনন্দের উৎস বয়ে গিয়েছিল, তাহলে এ যুবতী অসহায় সম্বলহীন, একে সহজেই আপন করে নিতে সক্ষম হবে সে, একে মনিরার অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হয়েছিল মঙ্গলসিন্ধ, তারপর মনিরার কণ্ঠস্বরে এবং আচরণে খুশি হল। মনিরাকে তাই মঙ্গলসিন্ধ বিয়ে করে একান্ত নিজের করে নেবে মনস্থ করল।

কথাটা মঙ্গলসিন্ধ বন্ধু কঙ্করসিংকে বলল—কঙ্কর, জীবনে বহু নারী আমি দেখেছি এবং পেয়েছি, কিন্তু এ নারীর মত সুন্দর গুণবতী নারী আমি কোনদিন দেখিনি। আমি একে বিয়ে করে রাণী করতে চাই----

কথাটা শুনে অদ্ভুতভাবে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল কঙ্কর সিং, তারপর হাসি থামিয়ে বলল–অজ্ঞাত অপরিচিত এক নারী হবে ঝিন্দের রাণী....হাঃ হাঃ হাঃ.....হাঃ হাঃ হাঃ। কঙ্কর সিংয়ের অট্টহাসির শব্দে বাগানবাড়ির কাঁচের জানালা কপাটগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, তুমি কেন, পৃথিবীর কেহ আমার এই -সংকল্পে বাধা দিতে পারবে না।

কঙ্কর সিং বলল—বেশ, তোমার যা মনে চায় তাই হবে।

কঙ্কর সিং মুখে 'বেশ হবে' বললেও অন্তরে তার একটা প্রচন্ড আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেদিন মেয়েটাকে আনতে তাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছিল। তার হাতে নিহত হয়েছে দু'জন লোক। এই লোক দু'জনকে হত্যা করতে তার শরীরেও আঘাত পেয়েছে, অথচ সেই নারীকে মঙ্গলসিন্ধ একা গ্রহণ করবে, এ কোনদিন হতে পারে না।

কঙ্কর সিং মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল, কেমন করে যুবতীটিকে হাতে আনবে।

মনিরার জন্যই কঙ্কর সিং আর মঙ্গলসিঙ্কের মধ্যে একটা হিংসার সৃষ্টি হল। কঙ্কর সিং চায় মনিরাকে বাগানবাড়িতে এনে তাকে নিয়ে আমোদ করতে।

হিংস্র জন্তুর মতই ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গেল কঙ্কর সিং।

এমন দিনে কঙ্কর সিং সাথী হিসেবে পেল বিনয় সেনকে। সেদিন বাগানবাড়িতে একা একা বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল কঙ্কর সিং, বিনয় সেন এসে বসল তার পাশে। মৃদু হেসে বলল–সিং বাহাদুর, আজ আপনাকে বড় ভাবাপন্ন লাগছে, ব্যাপার কি? নতুন কোন আমদানি নেই বুঝি?

বিনয় সেনকে দেখে খুশি হল কঙ্কর সিং, সোজা হয়ে বসে বলল—বিনয় সেন, আপনি এসেছেন–ভালই হল। একটা উপকার করতে হবে।

বলুন আমি কি উপকার করতে পারি?

কঙ্কর সিং একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর ফিসফিস করে বলল—সেদিন মঙ্গল আর আমি নৌকা ভ্রমণে গিয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী শিকার করে এনেছি।

বিনয় সেন বলে উঠল—অপূর্ব সুন্দরী শিকার তাও নদী বক্ষে—আশ্চর্য?

কঙ্কর সিং হাসল—বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা। তবে শুনুন, সেদিন আমি আর মঙ্গল বের হলাম। সঙ্গে শিকারের জন্য কিছু গোলাবারুদ নিলাম আর নিলাম কয়েকটা বন্দুক আর রাইফেল। ভোরে যাত্রা শুরু হল আমাদের। নদীবক্ষের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ আমি বললাম চল মঙ্গল, নদীর যে অঞ্চলে ঘন বন আছে সে দিকে চল—হরিণ শিকার করাও হবে, সে সাথে নৌকা ভ্রমণও সার্থক হবে। একটু থামল কঙ্কর, বিনয় সেন স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে। পুনরায় বলতে শুরু করল কঙ্কর আমার কথামতই মঙ্গল মাঝিদের আদেশ দিল নদীর দিকে চল। আমাদের নৌকা সেভাবে এগিয়ে চলল, যে দিকে ঘন বন।

বিনয় সেন বলে উঠল— তারপর?

তারপর আমাদের নৌকা যখন নদী বেয়ে বনের দিকে এগুচ্ছিলো তখন আমরা দেখতে পাই ঘন বনের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বজরা। শুধু বজরাই নয়, বজরার সামনে দুটি নারীমূর্তি। আমরা তো অবাক হলাম, এমন নির্জন নদীবক্ষে ঘন বনের ধারে বজরা এলো কোথা থেকে? শুধু বজরাই নয়, নারীও রয়েছে।

অত্যন্ত আগ্রহে বিনয় সেনের দু'চোখ বড় হয়ে উঠল, বলল—তারপর? তারপর?

আমাদের নৌকা অতিশীঘ্র বজরাখানার নিকটে পৌঁছে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই বজরার পাটাতন থেকে দু'টি নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়েছে—আমরা তো বজরার উপর লাফিয়ে নেমে পড়লাম, প্রথমেই বাধা দিতে এলো দু'জন পাহারাদার। একজনকে মঙ্গল নিহত করল আর একজনকে আমি। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন এগিয়ে এলো, কিন্তু আমাদের অস্ত্র আর শক্তির কাছে তারা অত্যন্ত দুর্বল। অল্পক্ষণেই বজরার প্রায় সব পুরুষকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আর মঙ্গল বজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। আর কেউ বাধা দেবার ছিল না, কাজেই স্বচ্ছন্দে বজরার কামরায় প্রবেশ করলাম। আশ্চর্য হলাম বজরার মধ্যে একটা অপ্সরীর মত সুন্দরী রমণীকে দেখে। তার চেয়েও আশ্চর্য হলাম রমণীর আচরণে। তাকে আমরা জোরপূর্বক পাকড়াও করে আনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কিন্তু সে অতি সহজে নিজের ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে চলে এলো।

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল—সে চলে এলো আপনাদের সঙ্গে---- মানে আপনাদের নৌকায়?

হাঁ বিনয় সেন, অদ্ভুত নারী ঐ রমণী!

বিনয় সেন এবার ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল—কোথায় সে রমণী সিং বাহাদুর?

কঙ্কর পুনরায় আর একবার কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল—এখন সে রাজ-অন্তপুরে।

রাজ-অন্তপুরে?

হাঁ, কারণ মঙ্গল বড় স্বার্থপর, আমার প্রচেষ্টায় সে এই অপ্সরীকে পেয়েছে অথচ সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে একাই তাকে আত্মসাৎ করতে চায়।

বিনয় সেনের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে আসে, বলে—এ তার অন্যায়।

শুধু অন্যায় নয়, তার অপরাধ। মঙ্গল তাকে রাণী করতে মনস্থ করেছে।

রাণী!

হাঁ বিনয় সেন, মঙ্গল এই যুবতীকে বিয়ে করে রাণী করবে।

আর আপনি?

হাঃ হাঃ হাঃ—আর আমি, দাঁতে দাঁত পিষে বলল কঙ্কর–আমি তাকে রেহাই দেব? বিনয় সেন, জানি আপনি রাজকর্মচারী, কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

কিন্তু......

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই বিনয় সেন। আমি মঙ্গলকে হত্যা করব এবং সেই রমণীকে তার কবল থেকে উদ্ধার করব।

তারপর?

আবার হেসে ওঠে কঙ্কর—তারপর আমি তাকে হৃদয়ের রাণী করব।

বলে উঠল বিনয় সেন—আমার স্বার্থ কি? সিং বাহাদুর?

আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ দেব।

বলুন আমার কি কাজ? কি করতে হবে বলুন?

মঙ্গলসিন্ধ আপনাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে, আপনি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তার মনের কথা জেনে নেবেন। তারপর একদিন তাকে বাগানবাড়িতে এনে হত্যা করব...শুধু জানবেন আপনি আর জানব আমি।

নরহত্যা।

ভয় পাচ্ছেন কেন বিনয় সেন, এ বান্দা নরহত্যা করতে এতটুকু বিচলিত হয় না। তাছাড়া মঙ্গল নিরপরাধ লোক নয়, সে গুরুতর অপরাধী, তাকে হত্যা করা পাপ নয়।

তার মানে?

বিনয় সেন, আপনি রাজকর্মচারী হলেও রাজ-অন্তপুরের অনেক কথাই জানেন না।

না, তা জানি না, জানবার বাসনাও করি না।

আপনাদের প্রিয় রাজা নিহত হবার কথাটাও না?

বিনয় সেন এবার করুণ কণ্ঠে বলল—হাঁ, স্বর্গীয় রাজা জয়সিন্ধের খুনের ব্যাপারটা আজও আমার মনে বড় আঘাত হানছে।

শুনুন বিনয় সেন, আপনাদের প্রিয় রাজার হত্যাকারী অন্য কেউ নয়, তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধই তাকে হত্যা করেছে।

বিনয় সেন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল।

কঙ্কর সিং বলল—এখনও আপনি মঙ্গলকে হত্যা করা পাপ মনে করেন?

পিতৃ হত্যাকারীকে হত্যা করা তার প্রতি সুবিচার করা । পিতৃহত্যার শাস্তি তাকে সর্বশরীরে অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে লবণ মাখিয়ে তিলে তিলে শাস্তি দেওয়া।

হাঁ, ঠিকই বলেছেন বিনয় সেন, আমি মঙ্গলসিন্ধকে এভাবেই হত্যা করব।

তারপর রাজসিংহাসনের অবস্থা কি দাঁড়াবে সিং বাহাদুর?

এই চিন্তা, কেন আমি কি রাজ্য পরিচালনার অযোগ্য?

না না, ছিঃ ছিঃ আপনি এখন ঝিন্দের মন্ত্রীবর, আপনি কেন রাজকার্য পরিচালনায় অযোগ্য হবেন! কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাই সিং বাহাদুর।

আপনি আমাকে সিং বাহাদুর না বলে মন্ত্রীবর বলবেন—বিনয় সেন।

আপনার কথা মতই কাজ করব মন্ত্রীবর।

বলুন আপনি কি বলতে চাইছিলেন?

হাঁ, আমি বলছিলাম কি, কুমার বাহাদুর যাতে কিছু জানতে না পারে—যেমন সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। রাজ্যও যেন পান আর সেই রূপসী তরুণীও যেন হাতছাড়া না হয়।

বলুন আমাকে কি করতে হবে?

মন্ত্রীবর, এ বাগানবাড়ি আমাদের এই গোপন আলোচনার উপযুক্ত স্থান নয়। বরং আপনার বাড়িতে....

হাঁ, ঠিকই বলেছেন বিনয় সেন, মঙ্গল যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে যেতে পারে। চলুন আমরা অন্তপুরে গিয়ে বসি।

উঠে দাঁড়াল কঙ্কর সিং–চলুন।

বিনয় সেন কোনদিন কঙ্কর সিংয়ের অন্তপুরে আসেনি, আজ প্রথম এলো।

কঙ্কর সিং বিনয় সেনকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বসল বলল কঙ্কর সিং—বলুন বিনয় সেন?

হাঁ বলছিলাম, রাজা মঙ্গলসিন্ধ আপনাকে অনেক সমীহ করেন— বন্ধু বলে আপনার কথা মানেনও।

সে কথা মিথ্যা নয় কিন্তু আপনি কি আমাকে ভুলাচ্ছেন বিনয় সেন?

মোটেই না, আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করে একটা সাহায্য চেয়েছেন তখন আমি আপনার কথামত কাজ না করে কি পারি? আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলব?

বলুন বিনয় সেন, বলার জন্যই তো এখানে---- মানে আমার অন্তঃপুরে আপনাকে...

হাঁ, তা আমি জানি, দেখুন মন্ত্রীবর, আপনি যাতে একসঙ্গে ঝিন্দ রাজ্য এবং ঝিন্দের রাণী লাভ করেন---

কি বললেন আমাকে এত বড় নীচ প্রবৃত্তির মানুষ বলে মনে করছেন। যাকে মঙ্গল স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে সে নষ্ট মেয়েকে আমি আবার স্ত্রী বলে---

না না, সে কথা আমি বলছি না, বলছি আপনি রাজ্যলাভ এবং স্ত্রী লাভ যেন একই সঙ্গে করতে পারেন।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বিনয় সেন?

বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনি ধৈর্য ধরুন।

দেখুন বিনয় সেন, আমি চাই মঙ্গলসিন্ধ যেন ঐ সুন্দর তরুণীকে স্পর্শ করতে না পারে, এবং তাকে রাণী করার পূর্বেই যেন আমি মঙ্গলকে হত্যা করতে পারি। কারণ মঙ্গল আমাকে বলেছে জীবনে সে অনেক নারী দেখেছে কিন্তু এমন সুন্দরী নারী সে কোনদিন দেখেনি—অপূর্ব অদ্ভুত নারী নাকি এই সুন্দরী। এবং সে কারণেই মঙ্গল তাকে বাগানবাড়ির ক্ষণিকের সামগ্রী হিসেব নষ্ট করতে চায় না, তাকে চিরদিনের জন্য পাশে রাখতে চায়। মনস্থ করেছে সে তাকে বিয়ে করে রাণী করবে।

মৃদু হাসল বিনয় সেন, বলল—মঙ্গল সিন্ধের কবল থেকে তরুণী এত সহজে পরিত্রাণ পাবে এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন মন্ত্রীবর?

বিনয় সেন, আপনি ভুল করছেন, মঙ্গল আমাকে বলেছে—তাকে আমি বিয়ের আগে স্পর্শ করব না।

কঙ্কর সিংহের কথায় বিনয় সেন নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল তারপর কঙ্কর সিংয়ের কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল।

বিনয় সেনের কথায় কঙ্কর সিংয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো। হেসে বলল কঙ্কর সিং–বিনয় সেন, সত্যিই আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে। আপনার কথামত আমি কাজ করব।

বিনয় সেন তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করল।

❑

কঙ্কর সিং রাজদরবারে প্রবেশ করল। সংগে তার এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, বলল কঙ্করসিং—ইনি একজন সন্ন্যাসী এবং জ্যোতিষী।

মঙ্গলসিন্ধ রাজসিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীকে অভিবাদনপূর্বক নিজ আসনের পার্শ্বে বসাল। বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ আপনার আগমনের কারণ কি জ্যোতিষী বাবাজী। যদি কিছু মনে না করেন অধমকে বলেন তাহলে কৃতার্থ হই। জটাজুটধারী সন্ন্যাসী অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল—আজ রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তাই মন্ত্রীবর মহাশয়কে বলে স্বপ্নের বিবরণ আপনাকেও জানাতে এসেছি।

কঙ্কর সিং গম্ভীর কণ্ঠে বলল—হাঁ, সন্ন্যাসী বাবাজী যা বলছেন অতি সত্য কথা। এই বাবাজী পর্বতে বাস করেন, কোনদিন লোকালয়ে আসেন না। শুধু একবার এসেছিলেন বহুদিন পূর্বে যখন মহারাজ নিহত হবেন তখন।

চমকে উঠল মঙ্গলসিন্ধ।

কঙ্কর সিং বলল—তখন ইনি স্বপ্নে সব জানতে পেরেছিলেন।

মঙ্গলসিন্ধের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হলো।

কঙ্কর সিং বলল—সন্ন্যাসী বাবাজী অত্যন্ত ভাল লোক। তিনি কোন সময় কারও অমঙ্গল কামনা করেন না। যার যা অদৃষ্টে আছে তার তাই ঘটবে, এতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই।

মঙ্গলসিন্ধ তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্য বলল—বাবাজী, আপনি স্বপ্নে কি জ্ঞাত হয়েছেন জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী পুনরায় মুখে একটা শব্দ করে বললেন—হ্যাঁ, আমার স্বপ্নবার্তা জানাবার জন্যই আমি পর্বতের গুহা ত্যাগ করে এই রাজ দরবারে আগমন করেছি।

মঙ্গলসিন্ধ করজোড়ে বলল—বলুন দেব আপনার স্বপ্নবার্তা।

রাজদরবারের সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন, না জানি কি বলবেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

সন্ন্যাসী আসনে জেঁকে বসে হাতের চিমটাখানা মাটিতে তিনবার ঠক্ ঠক্ করে ঠুকে নিয়ে বললেন—ভোর রাতের স্বপ্ন অতি সত্য-অতি সত্য...মহারাজ, আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা গহন বনের মধ্যে আপনি বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। আপনার চারদিকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন সময় আপনার অদূরে এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি দেখা গেল....

থামলেন সন্ন্যাসী।

রাজা মঙ্গলসিন্ধের নিশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কঙ্কর সিং তার নিজের আসনে বসে তাকাচ্ছে রাজা মঙ্গলসিন্ধের মুখের দিকে। রাজদরবারের অন্যান্য রাজকর্মচারী বিপুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখের দিকে।

হাঁ, তারপর....বলতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী বাবাজী—আপনি তখন সেই নারীমূতির দিকে এগুচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই আপনি তার নাগাল পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশে অন্ধকারের ঘনঘটা আরও জমাট বেধে উঠেছে। অদূরে জ্যোতির্ময়ী নারী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে....

বলুন তারপর— ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল মঙ্গলসিন্ধ।

সন্ন্যাসী বলে চলেছেন—আপনি তখন প্রাণপণে ঐ নারীর দিকে ধাবিত হলেন। এমন সময় হঠাৎ অদ্ভুত এক দেবপুরুষের আবির্ভাব হলো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্তব্দ হয়ে দাঁড়ালেন। দেবমূর্তির চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এক অপূর্ব আলোর ছটা। দেবমূর্তি গম্ভীর কণ্ঠে আপনাকে লক্ষ্য করে বললেন—ক্ষান্ত হোন রাজা। ক্ষান্ত হোন—ঐ জ্যোতির্ময়ী নারী অতি পবিত্র। ওকে আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না। আপনি তখন নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে তাকিয়ে আছেন দেবমূর্তির দিকে....

সন্ন্যাসী বাবাজী বলুন, তারপর কি হলো?

সন্ন্যাসী বাবাজী পুনরায় মাটিতে তিনবার হাতের চিমটাখানা ঠক্ ঠক্ করে ঠুকে নিয়ে বললেন-ব্যস্ততা কেন বৎস! আমি ধীরে ধীরে স্বপ্নদৃশ্যের সব কথাই আপনার নিকট ব্যক্ত করব। হাঁ, আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি ঝিন্দ পর্বত থেকে এ মানবপুরীতে এসেছি, আপনার মঙ্গলই আমার কামনা—আপনি যখন নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সেই অদ্ভুত দেবমূর্তি বলে উঠলেন—জানি তুমি ওকে চাও, অতি নিজের করে পেতে চাও। কিন্তু ওকে স্পর্শ করার সংগে সংগেই তোমার মৃত্যু হবে—আপনি ৩খন চিৎকার করে বললেন, এর কি কোন প্রতিকার নেই? দেবমূর্তি

বললেন—আছে, কিন্তু সে অতি কঠিন কাজ। আপনি তখন প্রশ্ন করলেন—কি এমন কঠিন কাজ যা আমি ঐ নারীর জন্য করতে পারি না? তখন দেবমূর্তি খুশি হলেন, বললেন—তুমি ঐ জ্যোতির্ময়ী নারীকে তোমার হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাকে তোমার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর। তারপর ছ'মাস পর বিয়ে কর, তার পূর্বে নয়....এটুকু স্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর রাতের স্বপ্ন, কাজেই আমার মনের মধ্যে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সত্যই যদি আপনার হৃদয় সিংহাসনে কোন জ্যোতির্ময়ী নারীকে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করে থাকেন তবে আপনি বিরত থাকুন। নচেৎ মৃত্যু আপনার অনিবার্য।

মঙ্গলসিন্ধ ধ্যানগ্রস্তের মত এতক্ষণ সন্ন্যাসী বাবাজীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসী যা বলছেন তা অতীব সত্য। কারণ, যে নারীকে সে অজানা এক বজরা থেকে নিয়ে এসেছে ঠিক তার সংগেই তো মিলে যাচ্ছে সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা। বলল মঙ্গলসিন্ধ—বাবাজী, আপনি অনুগ্রহ করে আমার অন্তপুরে চলুন, নিরালায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

চলুন মহারাজ, চলুন। আপনার মঙ্গল কামনাই আমার ধর্ম। উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

মঙ্গলসিন্ধ তার রাজদরবারে সকলের নিকটে তখনকার মত বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীসহ রাজ-অন্তপুরে প্রবেশ করল।

❑

নিজের বিশ্রামকক্ষে এসে বসল মঙ্গলসিন্ধ। সন্ন্যাসী বাবাজীকে তার নিজের শয্যা ছেড়ে দিল, আপনি আমার শয্যায় আরামে বসুন।

সন্ন্যাসী বাবাজী দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় জেঁকে বসলেন, তারপর বললেন–বৎস, এবার আপনি মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করতে পারেন।

মঙ্গলসিন্ধ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলল—আপনি যা স্বপ্নে অবগত হয়েছেন তা সত্য।

আমি সব জানি বৎস, সব জানি। স্বপ্নে আমি সবই অবগত হয়েছি।

বাবজী, আমার অন্তপুরে একটি তরুণী আবদ্ধা রয়েছে।

আবদ্ধা...বলেন কি! তবে যে আমি স্বপ্নে জানতে পারলাম তাকে আপনি সসম্মানে....

গুরুদেব, আপনি ভুল বুঝবেন না। আবদ্ধা হলেও আমি তার প্রতি অন্যায় আচরণ করিনি।

খুশি হলাম বৎস, কারণ যে নারী এখন আপনার অন্তপুরে স্থান লাভ করেছে, সে অতি পবিত্র—দেবী সমতুল্য।

আমি তাকে বিয়ে করে রাণী করতে চাই গুরুদেব।

খুশি হলাম বৎস, কিন্তু বিয়ের পূর্বেই তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাণী করতে হবে। তারপর ছ'মাস সে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্টা থাকার পর তাকে মহাধুমধামের সঙ্গে বিয়ে করতে হবে।

আপনার কথা শিরধার্য গুরুদেব! আমি তাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাণী করব কিন্তু সে যদি রাণী হতে আপত্তি জানায়? এবং যতদূর সম্ভব সে নারী কিছুতেই রাণী হতে চাইবে না।

তাহলে তাকে কোনদিন আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না, করলে আপনার মৃত্যু হবে। আচ্ছা, আজ আমি চলি, আমার জপের সময় প্রায় আগত। সন্ন্যাসী বাবাজী উঠে দাঁড়ালেন।

মঙ্গলসিন্ধও সন্ন্যাসী বাবাজীর সংগে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, তার মুখমণ্ডলে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। করজোড়ে বলল মঙ্গলসিন্ধ—গুরুদেব, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার অন্তপুরে এসে যদি তার সংগে একটু দেখা করেন তাহলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

কিন্তু বৎস, আমিতো কোনদিন নারীমুখ দর্শন করি না মা কালীকা দেবীকে ছাড়া।

মা কালী দেবী আপনাকে সাক্ষাৎ দেন?

হাঁ বৎস, মা কালী তার এ অধম পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ না করে পারেন না।

কিভাবে আপনি তার সাক্ষাৎ লাভ করেন গুরুদেব?

সে অতি কঠোর কঠিন তপস্যা, সংক্ষেপে বলি। অমাবস্যার গভীর রাত্রে শ্মশানে সদ্য মৃতদেহের উপর বসে আমাকে তপস্যা করতে হয়। তপস্যা যদি সফল হয় তখন আকাশে মেঘ জমে ওঠে। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ

চমকায়, বজ্রপাত হয়—তারই মধ্যে মা কালী হাতে রক্তরাঙা খর্গ, গলায় নরমুণ্ডু, জিহ্বায় তাজা রক্তের আলপনা আমার সম্মুখে শশরীরে এসে দণ্ডায়মান হন.....

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—মা কালী শশরীরে এসে দণ্ডায়মান হন!

হাঁ বৎস, সেই একটি নারীমূর্তিই আমি জীবনে দেখেছি।

গুরুদেব, তাহলে আপনি তার সংগে সাক্ষাৎ করতে রাজী নন?

আপনি যখন বলছেন তখন না করি কেমন করে। তবে এক কাজ করতে হবে।

বলুন গুরুদেব কি করতে হবে?

আমি চক্ষু বন্ধ করে তার কক্ষে প্রবেশ করব, আপনি তার হাত আমার হাতের মুঠায় এনে দেবেন। আমি তাকে সব কথা বলব।

বেশ তাই করছি গুরুদেব, আসুন আমার সংগে।

❑

মনিরা কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছে; চোখের পানি যেন শুকিয়ে গেছে, আর কাঁদতে পারে না। হৃদয়টা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেছে তার। বারবার এই নির্মম পরিণতি—যার কোন শেষ নেই।

মনিরা শয্যায় শুয়ে নীরবে কাঁদছিল।

এমন সময় কক্ষের দরজা খুলে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে মঙ্গলসিন্ধ, সংগে তার জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হাত মঙ্গলসিন্ধের দক্ষিণ হাতের মুঠায়, চক্ষুদ্বয় মুদিত।

মনিরা মঙ্গলসিন্ধ এবং সন্ন্যাসী বাবাজীকে দেখে বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। মঙ্গলসিন্ধের পেছনে চক্ষু মুদিত সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে মনিরা বুঝতে পারল, সন্ন্যাসী অন্ধ।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—যুবতী, কোন ভয় নেই, এই সন্ন্যাসী বাবাজী তোমাকে দুটি কথা বলবেন।

মনিরা পুনরায় তাকাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

সন্ন্যাসী একটা শব্দ করে বলল— বৎস, ক্ষণিকের জন্য আপনাকে বাইরে যেতে অনুরোধ করছি।

মঙ্গলসিন্ধ নীরবে বাইরে চলে গেল।

সন্ন্যাসী এবার মুদিত আঁখি মেলে তাকাল, ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলল— মনিরা, আমি বিনয় সেন।

মনিরা, অস্ফুট শব্দ করে সন্ন্যাসীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো— আপনি এসেছেন।

হাঁ মনিরা, তোমাকে উদ্ধারের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। রাজা মঙ্গলসিন্ধকে আমি বলেছি তোমাকে রাণী করতে, ঝিন্দের রাণী।

এ আপনি কি বলছেন! চাই না আমি ঝিন্দের রাণী হতে।

মনিরা, তোমাকে ঝিন্দের রাণী করবে, বিয়ে করে রাণী নয়।

তুমি অমত করো না। আমি তোমাকে উদ্ধার করে নেব। দাও তোমার হাত আমার হাতে—দাও---দাও বিলম্ব করো না।

মনিরা সংকুচিতভাবে দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দিল সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী মনিরার হাত স্পর্শ করে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল মঙ্গলসিন্ধ, কড়জোড়ে বলল— গুরুদেব হয়েছে!

হাঁ হয়েছে বৎস! আমি যোগমন্ত্রদ্বারা এই যুবতীকে ঝিন্দের রাণী হবার যোগ্যতা সমর্পণ করলাম। এবার মনিরার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন সন্ন্যাসী—আসুন, এবার আমাকে রাজ-অন্তপুরের বাইরে নিয়ে চলুন। তপস্যার সময় আগত, বিলম্বে অমঙ্গল ঘটতে পারে।

মঙ্গলসিন্ধ সন্ন্যাসীর হাত ধরে তাকে কক্ষের বাইরে নিয়ে গেল।

মনিরা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। যাক বিনয় সেন তাহলে তার সন্ধান পেয়েছেন। এবার আর ভয়ের কোন কারণ নেই। হেমাঙ্গিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবার রাজা মঙ্গলসিন্ধের হাত থেকে তিনি রক্ষা করবেন। বিনয় সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মনিরার মন। চোখের পানি মুছে, এলো চুলগুলো খোপা করে বেঁধে পুনরায় শয্যায় গিয়ে বসল

এখন তার মুখমণ্ডল পূর্বের ন্যায় গম্ভীর থমথমে নয়, চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত নয়, একটা প্রসন্ন ভাব মুখে ফুটে উঠেছে।

❑

কঙ্কর সিং বিনয় সেনের হাত দু'খানা চেপে ধরল। নরম মোলায়েম গলায় বলল—আপনিই এখন আমার একমাত্র ভরসা, সহায় সম্বল। আমি ঐ যুবতীর জন্য পাগল হয়ে যাব। অহরহ আমার মনে ঐ একটি মাত্র মুখ জেগে আছে। বলুন বিনয় সেন, তাকে কি পাব?

সেই কারণেই তো আমি সন্ন্যাসীর বেশে রাজা মঙ্গলসিন্ধের রাজ দরবারে গিয়েছিলাম। মন্ত্রীবর শুধু সেই সুন্দরী লাভই হবে না, তার সঙ্গে রাজ্যলাভও হবে।

বিনয় সেন কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। দেখুন আমি রাজা হবার পর আপনাকে মন্ত্রী করবো।

মন্ত্রী!

হাঁ বিনয় সেন, আপনাকে আমি ঝিন্দ রাজ্যের মন্ত্রী করব।

খুশি হলাম। কিন্তু রাণী থাকাকালীন নয়, আপনি যখন রাজ সিংহাসনে উপবেশন করবেন তখন আপনি আমাকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাই হব। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব?

করুন?

আচ্ছা মন্ত্রীবর, আপনি রাজপরিবারের সমস্ত খবরই অবগত আছেন, তাই না?

হাঁ, রাজপরিবারের এমন কোন কথা বা কাজ নেই যা আমি জানি না।

বিনয় সেন বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলল তারপর বলল— মঙ্গলসিন্ধকে রাজ-সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে যখন আমরা ঝিন্দের রাজা করব তখন রাজা জয়সিন্ধের কোন বংশধর যদি

প্রতিবাদ জানিয়ে বসে বা সে নিজে রাজ সিংহাসনে উপবেশনের দাবী জানায়?

এবার কঙ্কর সিং বেশ ভাবাপন্ন হল, ললাটে চিন্তারেখা ফুটে উঠল— বিনয় সেন, আপনি যা বলেছেন অতীব সত্য। মঙ্গলকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে আমার বেশি বেগ পেতে হবে না কিন্তু--- থামল কঙ্কর সিং।

বিনয় সেন বলল— কিন্তু কি মন্ত্রীবর?

হাঁ আছে, রাজা জয়সিন্ধের ভগ্নি মায়ারাণীর এক পুত্র বিজয়সিন্ধ আছে। সে অতি নিষ্ঠাবান সৎচরিত্রবান যুবক। মামার মৃত্যুর পর সে একবার ঝিন্দে এসেছিল, কিন্তু মঙ্গলসিন্ধের আচরণে সে দুঃখিত ব্যথিত হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছে। রাজা জয়সিন্ধ তার এই ভাগিনাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেক সময় মঙ্গলের ওপর রাগ করে তাকে ঝিন্দ রাজ্যের রাজা করবেন বলে বলতেন। মঙ্গলের পিতৃহত্যার আর একটা কারণ রাজা জয়সিন্ধের এই উক্তি।

বিনয় সেন তন্ময় হয়ে শুনছিল কঙ্কর সিংয়ের কথাগুলো, এবার বলল— রাজা জয়সিন্ধ তাহলে ভাগিনা বিজয়সিন্ধকে রাজা করার মনোবাসনা পোষণ করতেন?

হাঁ, কারণ মঙ্গলসিন্ধের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত ছিল।

বিজয়সিন্ধ কি জয়সিন্ধের আপন ভগ্নির গর্ভজাত পুত্র?

হাঁ, এবং সে কারণেই আমি নিশ্চিন্ত নই বিনয় সেন। যদিও বিজয়সিন্ধ একজন মহৎ ব্যক্তি তবু মঙ্গলসিন্ধের অভাবে সে নিশ্চয়ই নিশ্চুপ থাকবে বলে মনে হয় না।

গভীর চিন্তারেখা ফুটে ওঠে বিনয় সেনের ললাটে। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল সে— ভাববার কথা, মঙ্গলসিন্ধের অভাবে সে ঝিন্দের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এটাও সত্য।

তাহলে কি করা যায় বিনয় সেন? আপনার ওপরই আমার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে।

ব্যস্ত হবেন না মন্ত্রীবর, ধৈর্য ধারণ করুন।

কিন্তু কত দিন?

যতদিন না মঙ্গলসিন্ধ পৃথিবী থেকে মুছে যায়। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ তাকে পেতেই হবে।

আমিও যে তাকে সহায়তা করেছিলাম বিনয় সেন।

আপনি তো রাজ-সিংহাসন লাভ করতে চলেছেন মন্ত্রীবর।

আমি সেই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী--

ঝিন্দের রাণী হলে সে তো আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে।

বিনয় সেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার সঙ্গে এই নিন আমার কণ্ঠের মুক্তার মালা।

ওটা আমি কি করব মন্ত্রীবর। আপনি মন্ত্রী, মুক্তার মালা আপনার গলাতেই শোভা পায়।

তবে কি দেব আপনাকে বলুন?

যখন রাজ সিংহাসন এবং রাণী দুটো আপনার হাতে আসবে তখন আপনি যা দেবেন তাই আমি খুশিমনে গ্রহণ করব।

সত্যি আপনার মত মহৎ ব্যক্তি আর নেই ইহজগতে। ঝিন্দের রাজা হবার পর আপনাকে আমি রাজমন্ত্রী করব কথা দিলাম।

আচ্ছা সে হবে তখন।

বিনয় সেন কিছুক্ষণ পায়চারী করলো, তারপর বলল— মন্ত্রীবর এবার কয়েকটি প্রশ্ন করব আপনাকে, সঠিক জবাব দেবেন। কারণ, কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করলে প্রয়োজন হতে পারে।

বলুন বিনয় সেন, আপনি যা জানতে চাইবেন তারই জবাব পাবেন। আমি সত্যি কেমন যেন বিভোর হয়ে পড়েছি। ঝিন্দ রাজ্য আমার চাই, তার সঙ্গে চাই সেই তরুণী। তাকে দেখা অবধি আমার হৃদয়ে এক ফোঁটা শান্তি নেই সব সময় তার চিন্তা আমাকে দগ্ধীভূত করে চলেছে।

রাজা মঙ্গলসিন্ধ কার পরামর্শে রাজা জয়সিন্ধকে হত্যা করেছে?

আপনাকে পূর্বেই বলেছি বিনয় সেন, রাজা জয়সিন্ধকে যদিও মঙ্গলসিন্ধ হত্যা করেছে, কিন্তু তাকে উৎসাহিত এবং সুযোগ করে দিয়েছি আমি। তার এই রাজ্যলাভের পেছনে রয়েছে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

সত্যি, এজন্য আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া উচিত।

হাঁ, আমার বুদ্ধি বলেই সে আজ ঝিন্দের রাজা।

মন্ত্রীবর, আপনি মঙ্গলসিন্ধকে সরিয়ে ঝিন্দের রাজা হলে বিজয়সিন্ধ এসে আপত্তি করে বসতে পারে। কাজেই তাকেও সরাতে হবে।

ঠিক বলেছেন বিনয় সেন, ঝিন্দরাজ্য লাভ করতে হলে রাজবংশের কাউকে---

জীবিত রাখা চলবে না।

আমার মনের কথাই আপনি বলেছেন বিনয় সেন।

কিন্তু বিজয়সিন্ধকে সরাতে হলে কাজে নামার পূর্বে তার আবাসস্থলের ঠিকানা জানতে হবে।

এটা সামান্য ব্যাপার, বিজয়সিন্ধ ঝিন্দ রাজ্যের জরাসন্ধী নগরে বাস করে। তার পিতামাতা বহুদিন পূর্বে মারা গেছে।

সে এখন কি করে মন্ত্রীবর?

ছবি আঁকা তার নেশা, পেশাও বলা চলে, কারণ বিজয়সিন্ধ নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বিনয় সেন বলল— রাজভাগিনা হয়ে তাকে ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় কেন?

আপনি তাকে জানেন না বলে কথাটা বললেন বিনয় সেন। বিজয়সিন্ধ অদ্ভুত লোক, পরের সাহায্য সে কোন সময় কামনা করে না। তা ছাড়াও তার একটা দোষ আছে, নিজের উপার্জন দিয়ে নিজেরই চলে না, তবু সে শহরের দীন-দুঃখীকে নিজে না খেয়ে বিলিয়ে দেয়। নিজে হয়তো উপোস করে মরে।

নিস্পলক নয়নে কঙ্কর সিংহের কথাগুলো শুনছিল বিনয় সেন, মুখমণ্ডলে তার অপূর্ব একটা জ্যোতির লহরী খেলে যায়। তাড়াতাড়ি বিনয় সেন নিজের মুখমণ্ডলে কঠিন ভাব ফুটিয়ে তোলে।

সেদিন আর বেশিক্ষণ কঙ্কর সিং এবং বিনয় সেনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে না।

❑

জরাসন্ধী শহরের এক প্রান্তে ফুল্লরা নদী। নদীতীরে পাশাপাশি কয়েকখানা একতলা বাড়ি। নদীতীর ঘেঁষে যে বাড়িটা সেটা বেশ বড় এবং পুরানো। এককালে বাড়ির যে জৌলুস ছিল আজও তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু

বহুদিন বাড়িটা মেরামত না করায় স্থানে স্থানে ধ্বসে পড়েছে। তবু বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে কাল প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে।

নিশীথ রাত।

জরাসন্ধী শহরটা যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝিন্দ রাজ্যেরই একটা অঙ্গ এই জরাসন্ধী। এ শহর ঝিন্দের মত পর্বত আর পাহাড়ে ঘেরা নয়, শস্যশ্যামলা বনানী ঢাকা একটা পরিচ্ছন্ন শহর।

রাত বেশি হওয়ায় শহরের পথ-ঘাট-মাঠ নীরব নিস্তব্ধ। দ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। বাতাস বইছে গৃহহারা পথিকের দীর্ঘশ্বাসের মতই থেকে থেকে। .

ফুল্লরা নদীতীরে দোতলা বাড়িখানার একটা কক্ষে এখনও আলো জ্বলছে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ক্যানভাসের ওপর তুলির পরশ বুলিয়ে চলেছে রাজা জয়সিন্ধের ভাগিনা বিজয়সিন্ধ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে চিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

শিল্পী ছবি আঁকা শেষ করে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার অপূর্ব এই সৃষ্টির দিকে, অদূরস্থ কোন গীর্জা থেকে সময় সময় সংকেত শোনা যায়। রাত দ্বিপ্রহর।

বিজয়সিন্ধ তখনও নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার সম্মুখস্থ চিত্রখানার দিকে।

হঠাৎ চিত্রের উপরে একটা কাল ছায়া এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকাল বিজয়সিন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল কে'?

অতি নরম মোলায়েম কণ্ঠস্বর—শত্রু নই—বন্ধু।

কে—কে আপনি'?

আমি একজন মানুষ।

আপনার নাম'?

বিনয় সেন।

আপনি, আপনি---

হাঁ, আমি ঝিন্দের রাজকর্মচারী।

এখানে কি প্রয়োজন'?

প্রয়োজন আছে বিজয়সিন্ধ, আসুন কথা আছে আপনার সঙ্গে।

এত রাতে কি এমন কথা রাজকর্মচারী'? আপনি কাল ভোরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অনেক খুশি হতাম।

যে কথার জন্য এই মুহূর্তে আমি এখানে এসেছি, সে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

হাসল বিজয়সিন্ধ, তারপর বলল—ঝিন্দের রাজপরিবারের এমন কোন গুরুত্বপুর্ণ কথা থাকতে পারে না যা আমার অতি--

আপনি ভুল করছেন বিজয়সিন্ধ, আপনি আমার কথা শুনুন, আসুন আমার সঙ্গে।

চলুন রাজকর্মচারী, কিন্তু আমার বাড়িতে আপনাকে বসতে দেবার মত রাজকীয় আসন তো নেই।

এবার বিনয় সেনের ভ্রুকুঞ্চিত হল, বলল সে— রাজকর্মচারী বলে কেন আপনি আমাকে উপহাস করছেন?

উপহাস করিনি বিনয় সেন, যা সত্য তাই বলেছি। শুনেছি আপনি রাজা মঙ্গলসিন্ধের দক্ষিণ হাত। আপনি মঙ্গলের রাজকর্মচারী হতে পারেন কিন্তু আমার কাছে আপনি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নন।

হাঁ, তাই আমি চাই, আমি এখানে রাজকর্মচারী হিসেবে আসিনি, এসেছি একটি কথার জন্য।

কথা?

হাঁ, মঙ্গলসিন্ধ বা রাজপরিবারের কেউ আমাকে পাঠাননি।

তবে?

আমি—আমি এসেছি দয়া করে যদি আমার কথা শোনেন।

বিজয়সিন্ধ বিনয় সেনসহ নিজের শয়নকক্ষে এসে আসন গ্রহণ করল।

উভয়ে তাকিয়ে আছে উভয়ের মুখের দিকে।

বিজয় সেন লোকমুখে শুনেছে, বিজয় সেন রাজা মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গীসাথী বা অনুচর। শয়তান মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গী ও সাথী তারই মত কুৎসিত, কুচরিত্র, দুষ্টলোক হবে। কিন্তু বিজয়সিন্ধ যতই বিনয় সেনকে দেখছে ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার কথাবার্তা বা চালচলনেও তো নেই কোন দুষ্ট মনোভাব।

বিনয় সেনও বিজয় সিন্ধের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক নয়নে—বিজয়সিন্ধ শুধু সুন্দর পুরুষই নয়, একজন মহাপুরুষও বটে। সে যে একজন গুণী লোক তা তার চেহারায় ফুঠে উঠেছে। বিনয় সেন বুঝতে পারেন, কঙ্কর সিং-এর একটি কথাও মিথ্যা নয়। বিজয়সিন্ধ সত্যই অতি মহৎ ব্যক্তি।

বিনয় সেন ভাবছে বিজয়সিন্ধের কথা।

বিজয়সিন্ধ ভাবছে বিনয় সেনের কথা।

কথা বলল বিনয় সেন—রাজপুরী থেকে এলেও আমি রাজ আদেশে আসিনি।

আপনি কি তবে নিজের ইচ্ছামত এসেছেন?

হাঁ, একটা গোপনীয় কথা আছে বিজয়সিন্ধ।

বলুন?

আমি জানি আপনি মহারাজ জয়সিন্ধের অতি আদরের ভাগিনা।

হাঁ, মামা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

অবশ্য তার কারণ ছিল।

কারণ, কি কারণ থাকতে পারে বিনয় সেন? মামা যদি ভাগিনাকে আদর করে তার কারণ--

আছে, কারণ তাঁর পুত্র মঙ্গলসিন্ধ মানুষ নয়। মহারাজ জয়সিন্ধ নিজ পুত্রকে কোনদিন বিশ্বাস করতেন না।

বিজয়সিন্ধ নিশ্চুপ রইল।

বিনয় সেন বলে চলে— জয়সিন্ধ পুত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর অভাবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালনা মঙ্গলের পক্ষে অসম্ভব হবে। প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই প্রজাদরদী রাজা আপনাকেই তাঁর রাজ-সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন।

এ কথা আপনি জানলেন কি করে? এটা তিনি নিজের মনের মধ্যে পোষণ করতেন বটে এবং তা একমাত্র জানত মঙ্গল—

আমিও জানতাম বিজয়সিন্ধ, আর জানতাম বলেই আজ আমি আপনার নিকটে এসেছি।

কারণ?

কারণ, ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপযুক্ত রাজার প্রয়োজন।

মুহূর্তে বিজয়সিন্ধের মুখ কাল হয়ে উঠল—আপনি আমাকে রাজ্যের মোহ দেখিয়ে-----

না না, আপনি ভুল বুঝছেন বিজয়সিন্ধ, আমি আপনার হিতৈষী।

রাজ্যলোভ আমার নেই, আপনি যেতে পারেন। তাছাড়া মঙ্গলই আপনাকে পাঠিয়েছে আমার মনোভাব জানতে, তাই নয় কি?

না, মঙ্গলসিন্ধ আমাকে পাঠাননি বা আমি তার কথাতে আসিনি।

তবে?

আমি একজন ঝিন্দ নাগরিক। আমি ঝিন্দরাজ্যের অধিবাসীগণের মনের ব্যথা সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করে রাজকাজে নিযুক্ত হয়েছি। প্রজাদের দুঃখ বেদনা যে রাজা বুঝে না, তাকে সরিয়ে সিংহাসনের উপযুক্ত লোককে রাজসিংহাসনে বসাতে চাই। এটা আমার কল্পনা নয়, আমার আন্তরিক বাসনা। বিজয়সিন্ধ, আপনি আমার অনুরোধ অবহেলা করবেন না। কথা দিন।

আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়।

কেন?

প্রথমত, রাজ্যলোভ আমার নেই, দ্বিতীয়ত মঙ্গল এখন ঝিন্দের রাজা, তৃতীয়ত রাজা হবার যোগ্যতা আমার নেই।

বিনয় সেন হাসল— রাজ্যলোভ আপনার নেই, এ আমি জানি, আর নেই বলেই আপনি রাজা হবার যোগ্য ব্যক্তি। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হবার একেবারে অযোগ্য কাজেই তাকে রাজসিংহাসন থেকে সরাতে হবে।

বিনয় সেন, আমি অন্যায় কোনদিন মানি না। মঙ্গল আযোগ্য হলেও সে রাজসিংহাসনের অধিকারী, আমি এ কথায় রাজী হতে পারি না।

মঙ্গলসিন্ধ রাজসিংহাসনের অধিকারী হলেও প্রজাগণ তাকে চায় না। প্রজাদের মঙ্গল সাধনই তো রাজধর্ম। কিন্তু মঙ্গলসিন্ধ তার বিপরীত, সে প্রজাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। প্রজাদের ওপর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের স্ত্রী-কন্যা জোর করে নিয়ে এসে করছে ব্যভিচার-বিজয়সিন্ধ এতে শুনেও কি আপনার মনে দয়া হয় না? আপনার নিজের জন্য নয়, প্রজাদের সুখের জন্য আপনাকে ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপবেশন করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই তো মানবধর্ম।

বিনয় সেনের মুখের দিকে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বিজয় সিন্ধ। অনেকটা নরম হয়ে আসছে সে। বলল এবার— মঙ্গল সিন্ধ রাজা হবার অযোগ্য হলেও সে এখন রাজসিংহাসনের অধিকারী, কাজেই ---

আপনি শুধু মত করুন বিজয়সিন্ধ আর সমস্ত দায়িত্ব আমার।

বেশ, ন্যায়ের জন্য আমি আপনার কথা মেনে নিলাম।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল— এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বিজয়সিন্ধ আবেগভরা গলায় বলল—আপনার ব্যবহারে আমি তুষ্ট হয়েছি। রাজকর্মচারী হয়ে আপনি এত সদয় সেজন্য সত্যি আমার আনন্দ হচ্ছে।

আচ্ছা চলি তাহলে, যখন ডাকব তখন কিন্তু চাই আপনাকে।

নিশ্চয়ই! আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারব না।

বিনয় সেন বেরিয়ে যায়।

নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বিজয়সিন্ধ, ভাবে আশ্চর্য এই যুবক! যেমন সুন্দর চেহারা তেমন অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার ও কথাবার্তা।

❑

মনিরা আজ ঝিন্দের রাণী।

মণিমাণিক্য খচিত রাজকীয় পোশাক তার শরীরে শোভা পাচ্ছে। মাথায় মুকুট। হাতে ঝিন্দ রাজ্যের প্রতীক ন্যায়দণ্ড।

স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা মনিরা।

রাজদরবারে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট রাজকর্মচারিগণ।

মনিরা তাকায়—একটি আসন শূন্য। অনুমানে বুঝে সে এটাই বিনয় সেনের আসন, কিন্তু সে কোথায়?

মনিরা নিজেকে বিপন্ন মনে করে। ঝিন্দের রাজসিংহাসনে সে উপবিষ্ট হয়েছে একমাত্র বিনয় সেনের অনুরোধে, কিন্তু কোথায় সে?

মনিরা মঙ্গলসিন্ধকে লক্ষ্য করে বলল— কুমার, রাজদরবারে সবাই কি এসেছেন'?

না, একমাত্র বিনয় সেনকে দেখছি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন জটাজুটধারী সেই সন্ন্যাসী। দক্ষিণ হাতে আশা, বাঁ হাতে চিমটা, মুখে বম্ বম্ শব্দ। রাজদরবারে সন্ন্যাসীর আগমন হতেই সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল ঝিন্দের রাণী মনিরা। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল—, মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিং সকলেই—

সন্ন্যাসীর চক্ষুদ্বয় মুদিত, অতি ধীরে ধীরে এগুলেন তিনি। মঙ্গলসিন্ধ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে রাজসিংহাসনের পাশে নিজের আসনে বসল। তারপর বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে—গুরুদেব, আপনার আগমনের কারণ যদি দয়া করে বলেন? হাঁ বলার জন্যই আজ আমার আগমন।

বলুন গুরুদেব?

ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপযুক্তা রাণীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেখে অনেক খুশি হলাম।

এ আপনার অনুগ্রহ দেব।

এবার বিচার চাই।

বিচার?

হাঁ, আমার ওপর স্বপ্নাদেশ হয়েছে, মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যার বিচার হোক।

মঙ্গলসিন্ধ একবার মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে নিল।

মন্ত্রী কঙ্করসিং দৃষ্টি নত করে নিল, তার মনোভাব হত্যাকারীর বিচার হওয়াই প্রয়োজন। মনে মনে এটাই কামনা করে সে। কাজেই কংকর সিং নীরব রইল।

সন্ন্যাসী তার আশা বার কয়েক মাটিতে ঠুকে বললেন— রাণী, এই বিচার করুন। আমি এই কক্ষের সকলেরই হাত গণনা করব।

সন্ন্যাসী নিজের হাত বাড়ালেন— চক্ষুদ্বয় তখনও মুদিত, বললেন তিনি—আমি কারও মুখ বা হাতের রেখা চোখে দেখব না শুধু স্পর্শ করে বলব।

মঙ্গলসিন্ধের বুকের মধ্যে তখন টিপ টিপ শুরু হয়েছে। সর্বনাশ হবে—এবার উপায়?

ইতোমধ্যে রাজকর্মচারীগণ একে একে উঠে দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাসী বাবাজীর দিকে।

সন্ন্যাসী সবাইকে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে বলে দিচ্ছেন। অদ্ভুত মন্ত্রবল সন্ন্যাসীর।

ভয়বিহ্বলে মঙ্গলসিন্ধ বারবার তাকাচ্ছে সন্ন্যাসীর দিকে। হঠাৎ বলেই বসল সে— গুরুদেব, রাজদরবারের সকলের হাত স্পর্শ করেই আপনি সকলের মনের কথা বলে দিলেন। এবার সকলেরই হাত দেখা শেষ হয়েছে, আমার পিতার হত্যাকারী রাজদরবারে নেই।

সন্ন্যাসী বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করলেন, তারপর বললেন— আমি যোগবলে জানতে পারছি মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যাকারী এই রাজদরবারেই রয়েছে।

এ্যাঁ, বলেন কি গুরুদেব। কে সে হত্যাকারী নরাধম? আমার পিতাকে যে হত্যা করেছে তাকে এই মুহূর্তে আমি বন্দী করব।

সন্ন্যাসী বললেন— ঝিন্দরাণী, আপনি আপনার সৈন্যদের আদেশ করুন মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে বন্দী করতে। আমি এই মুহূর্তে আমার গণনা--

মঙ্গলসিন্ধ ভয়ার্তকণ্ঠে বলল— বিনয় সেনকে আমি রাজদরবারে দেখছি না, নিশ্চয়ই সেই আমার নিরপরাধ পিতাকে হত্যা করেছে এবং সেই কারণেই সে আজ রাজদরবারে আসেনি।

সন্ন্যাসী বললেন— আমারও তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখনও দু'জনের হাত দেখা বাকী আছে। আসুন রাজা মঙ্গলসিন্ধ, আপনার হাত খানা দিন। আসুন, বিলম্বে অমঙ্গল হবে।

মঙ্গলসিন্ধ কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর দিকে। অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতখানা এগিয়ে দিল।

সংগে সংগে সন্ন্যাসী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন— আমি এটা কার হাত স্পর্শ করেছি?

রাজদরবারের সকলেই একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন— কুমার মঙ্গল সিন্ধের।

চিৎকার করে উঠলেন সন্ন্যাসী—বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি চক্ষু খুললাম--

চোখ মেলে মঙ্গলসিন্ধকে দেখে বলে উঠলেন সন্ন্যাসী—কুমার, আপনি পিতৃহন্তা।

সেই মুহূর্তে ঝিন্দরাণী মনিরা কঠিনকণ্ঠে বলল— গ্রেফতার কর পিতৃহন্তা মঙ্গলসিন্ধকে।

অমনি সশস্ত্র সৈনিক মঙ্গলসিন্ধকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের উদ্যত তরবারির অগ্রভাগ গিয়ে ঠেকলো মঙ্গলসিন্ধের বুকে। হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো।

এবার সন্ন্যাসী মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের দিকে হাত বাড়াল— এসো বৎস ,তোমার হাত দেখা এখনও বাকী।

কঙ্কর সিং জানত সন্ন্যাসী অন্য কেউ নয়, বিনয় সেন এবং তার সঙ্গে পরামর্শ করেই সে এ কাজ করেছে, কাজেই সে অতি সহজেই এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী কঙ্কর সিংয়ের হাত ধরে বিড় বিড় করে কিছু মন্ত্র পাঠ করলেন তারপর বললেন— রাজা মঙ্গলসিন্ধের পিতৃহত্যার পরামর্শ দাতা এই মন্ত্রীবর, একেও গ্রেফতার করা হোক।

মুহূর্তে কঙ্করসিং ভয়ংকর এবং হিংস্র মূর্তি ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে তরবারি খুলে আঘাত করল সন্ন্যাসীর মাথায়।

সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে দাঁড়াল, আঘাত তার আসনে গিয়ে বিদ্ধ হল।

রাণী আদেশ দিল— বন্দী কর— মন্ত্রীকে, বন্দী কর।

সৈনিকগণ এবার মন্ত্রীবর কঙ্করসিংকেও বন্দী করে ফেলল।

মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিং বন্দী হয়ে হিংস্র জন্তুর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ ফুটে উঠেছে আর কঙ্করসিংয়ের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, দাঁতে দাঁত পিষে বলল— বিনয় সেন, তোমার ভণ্ডামি বুঝতে পেরেছি। সেই কারণেই তুমি আমার নিকটে মহারাজ হত্যার গোপন রহস্য জেনে নিয়েছ। তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না।

বিনয় সেন তখন নিজের সন্ন্যাসী ড্রেস খুলে ফেলল। মঙ্গলসিন্ধ হুঙ্কার ছাড়ল এবার— শয়তান বিনয় সেন তুমি, মিথ্যা সন্ন্যাসী সেজে আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। সৈনিকগণ— আমি রাজা, আমার আদেশ বিনয় সেনকে গ্রেফতার কর! গ্রেফতার কর!

কিন্তু রাজদরবারের সবাই মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিং বন্দী হওয়ায় যারপরনাই খুশি হয়েছেন। মহারাজ হত্যারহস্য উদঘাটন হওয়ায় সকলেই বিনয় সেনের বুদ্ধির প্রশংসা করছেন, সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন— ঝিন্দরাণী কি জয়! ঝিন্দরাণী কি জয়! বিনয় সেন কি জয় --

সৈনিকগণ মঙ্গলসিন্ধের কথা কানেও নিল না। সবাই এক সঙ্গে ঝিন্দরাণী আর বিনয় সেনের জয়ধ্বনিতে রাজদরবার মুখরিত করে তুলল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে মঙ্গলসিন্ধের মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠেছে। কঙ্কর সিং ক্রুদ্ধ সিংহের মত দাঁত কড়মড় করছে, এই মুহূর্তে ছাড়া পেলে সে দেখে নিত বিনয় সেনকে : কিন্তু সে সুযোগ দিল না সৈনিকগণ। ঝিন্দারাণীর

আদেশে মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংকে বন্দী অবস্থায় দরবারকক্ষ থেকে নিয়ে গেল কারাগারের দিকে।

❑

দুশ্চরিত্র লম্পট রাজা মঙ্গলসিন্ধ রাজচ্যুত এবং বন্দী হওয়ায় প্রজাদের মনে আনন্দ ধরে না। সেই সঙ্গে মন্ত্রী কঙ্করসিং বন্ধী হওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

মহারাজ জয়সিন্ধের অকস্মাৎ মৃত্যু প্রজাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রজাদের মনে আশংকা ছিল মহারাজের মৃত্যুর পর রাজ্যের কি পরিণতি হবে। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হলে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে, এটা তারা মনে প্রাণে উপলব্ধি করত।

মহাপ্রাণ রাজার মৃত্যুর পর মঙ্গলসিন্ধ যখন রাজা হলো, এবং তার অসৎচরিত্র বন্ধুবর কঙ্করসিংকে যখন মন্ত্রী করা হলো তখনই প্রজাদের মুখ কাল হয়ে উঠল, চোখে সবাই অন্ধকার দেখতে লাগল। এবার তার অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তাই চিন্তা করতে লাগল সবাই।

প্রজাগণ যা ভেবেছিল তাই সত্য হলো। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হওয়ার পর রাজ্যময় শুরু হলো এক অশান্তির জ্বালাময় পরিস্থিতি। প্রজাদের ধরে এনে অযথা নির্যাতন শুরু হলো। কাউকে কারাগারে বন্দী করা হলো, কাউকে দাসরূপে ব্যবহার করতে লাগল, কারও স্ত্রী-কন্যা মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হলে তার নিস্তার নেই, বাগানবাড়িতে তাকে চাই-ই-চাই।

মহারাজ জয়সিন্ধ থাকাকালীন কুমার মঙ্গলসিন্ধ প্রজাদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করলেও তাকে করতে হত গোপনে। অনেক সময় এজন্য পিতার নিকট কুমারকে কঠিন শাস্তিও পেতে হত। কাজেই প্রজাদের ওপর নির্যাতন করে তার তৃপ্তি হত না।

সে কারণেই কঙ্করসিংয়ের পরামর্শে মঙ্গলসিন্ধ পিতাকে হত্যা করেছিল এবং নিজে রাজসিংহাসনে উপবেশন করে প্রজাদের প্রতি

চালাচ্ছিল নির্মম অত্যাচার। বিনা দোষে বহু নিরীহ প্রজা মঙ্গলসিন্ধের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগল। কাউকে স্ত্রী-কন্যা সঁপে দিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে, কেউ বা কলংকের কালিমা মুছে ফেলার জন্য ঝিন্দ নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

রাজা মঙ্গলসিন্ধ আর মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের অত্যাচারে দেশবাসী যখন অতিষ্ঠ ঠিক সেই মুহূর্তে ঝিন্দের সিংহাসনে ঝিন্দের রাণী হিসেবে অধিষ্ঠিত হলো মনিরা।

মনিরা ঝিন্দের রাণী হয়ে বিনয় সেনের পরামর্শমত রাজ্য চালনা করতে লাগল। রাণীর ন্যায়বিচারে ঝিন্দবাসীর মনে আনন্দ আর ধরে না। সবাই মনেপ্রাণে ঝিন্দরাণীর মঙ্গল কামনা করতে লাগল।

বিনয় সেনের সহযোগিতায় রাজ্য চালনায় মনিরার কোন অসুবিধা হলো না।

এখানে মনিরা যখন ঝিন্দের রাণী তখন শূন্য বজরায় সুফিয়া একা একা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আজকাল বিনয় সেনও সব সময় বজরায় আসে না। তবু সুফিয়ার মনে সদা ভয়, না জানি আবার কখন কোন বিপদ এসে পড়বে।

বিনয় সেন একদিন বজরায় ফিরে এলে বলল সুফিয়া— ভাইজান মনিরার কোন সন্ধান পেলেন'?

আজ বিনয় সেনের চেহারায় একটা আনন্দ ভাব ফুটে উঠেছে। শুধু ঝিন্দের রাজসিংহাসনে ঝিন্দের রাণী হিসেবে মনিরাই প্রতিষ্ঠিতা নয়, দুষ্ট রাজা মঙ্গলসিন্ধ ও শয়তান মন্ত্রী কঙ্কর সিং বন্দী। বিনয় সেন এখন ঝিন্দের কাজ অনেকটা গুছিয়ে এনেছে। এখন বাকী ঝিন্দ সিংহাসনে উপযুক্ত রাজা, সে কাজও প্রায় ঠিক করে ফেলেছে বিনয় সেন, এখন শুধু বিজয়সিন্ধকে এনে ঝিন্দের রাজা হিসেবে অভিষেক করা। সুফিয়ার কথায় বলল সে— মনিরার সন্ধান আমি পেয়েছি বোন, সে এখন ঝিন্দের রাণী।

বলছেন কি ভাইজান, এ কথা সত্য।

হাঁ, সত্য।

তাহলে কি রাজা মঙ্গলসিন্ধ তাকে---

না, বিয়ে করে রাণী নয়, মনিরা মঙ্গলসিন্ধ ও তার দুষ্ট মন্ত্রী কঙ্করসিংকে বন্দী করে রাণী হয়েছে।

সত্যি'?

হাঁ সত্যি!

কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার! আচ্ছা ভাইজান, তাহলে মনিরাকে আমি আর কোনদিন দেখতে পাব না?

পাবে সুফিয়া। সে কান্দাই শহরের মেয়ে, ঝিন্দে সে চিরদিন থাকতে পারবে না, কাজেই সে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং কান্দাই শহরে ফিরে যাবে।

তাহলে ঝিন্দের রাজসিংহাসনের অবস্থা কি হবে?

ঝিন্দ রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ব্যক্তিই রাজা হবেন এবং অচিরেই হবেন।

মনিরার ফিরে আসার কথা শুনে সুফিয়ার মনে অনাবিল একটা আনন্দস্রোত বয়ে চলল।

বিনয় সেন বুঝতে পারল, সুফিয়া মনিরার আগমন আশায় খুশিতে আত্মহারা হয়েছে। আর কতদিন বেচারী এমন একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারে।

❑

ঝিন্দের রাণীর ন্যায়বিচারে একদিন পিতৃহন্তা রাজকুমারের ফাঁসি হয়ে গেল। আর কঙ্কর সিংয়ের হলো দ্বীপান্তর। বহুদূরে নীল সাগরের ওপারে তাকে রেখে আসা হলো।

এবার বিনয় সেন ঝিন্দ রাজ্যের উপযুক্ত লোক বিজয়সিন্ধকে ঝিন্দ রাজসিংহাসনে বসল। অভিষেক করল বিনয় সেন নিজে।

ঝিন্দ রাজ্যের প্রজাগণ পূর্ব হতেই বিজয় সিন্ধকে জানত। তার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ ছিল। বিজয়সিন্ধ ঝিন্দের রাজসিংহাসনে আরোহণ করায় ঝিন্দ রাণীর মনে আনন্দের উৎসব বয়ে চলল। সবাই খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে উৎসবে মেতে উঠল। ঝিন্দ নগরী আলোয় আলোময় হয়ে উঠল।

বিজয়সিন্ধ ঝিন্দের রাজার হলো। এবার ঝিন্দরাণী মনিরা প্রজাদের কাছে বিদায় নিয়ে বিনয় সেনের সঙ্গে ফিরে এলো তার বজরায়।

ঝিন্দারাণীকে বিদায় দিতে ঝিন্দবাসীদের চক্ষু অশ্রুসজল হলো। দু'মাস ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছিল মনিরা ঝিন্দরাণী হিসেবে। এ দু'মাস প্রজাদের সুখের অন্ত ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল প্রজাগণ। বিনয় সেনের সহযোগিতায় মনিরা প্রজাদের ওপর ন্যায়বিচার করেছে। যাতে প্রজাদের মঙ্গল হয় সে কাজ করেছে, তাই মনিরাকে বিদায় দিতে ঝিন্দাবাসীর মনে দুঃখের ছোয়া লাগল।

কিন্তু বিজয়সিন্ধকে রাজা হিসেবে পেয়ে আবার তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঝিন্দ রাজ্যের উপযুক্ত রাজা হলো বিজয়সিন্ধ। সৌম্য সুন্দর দীপ্তকান্তি যুবক বিজয়সিন্ধ এখন ঝিন্দের রাজা। বিনয় সেনের পরামর্শেই পুনরায় বৃদ্ধমন্ত্রীকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। আবার শান্তি ফিরে এলো ঝিন্দ রাজ্যের বুকে।

বিনয় সেন এবার বিদায় চাইল।

বিজয়সিন্ধ তাকে আলিঙ্গন করে বলল—আপনি শুধু ঝিন্দ রাজকর্মচারীই ছিলেন না, আপনি একজন ঝিন্দ রাজ্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তি ছিলেন। আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকের পাঁজর চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধু, আপনি মানুষ নন— দেবতা।

বিজয়সিন্ধের কাছে বিদায় নিতে বিনয় সেনের চোখ দুটোও শুষ্ক ছিল না। একটা মায়ার আবেষ্টনী অক্টোপাশের মত তাকে যেন আকর্ষণ করছিল।

চলে যাবার সময় বিনয় সেন একটা চিঠি বিজয়সিন্ধের হাতে দিয়ে বলল— আজ থেকে দশ দিন পর এ চিঠির খাম ছিঁড়ে আপনি পড়বেন, সাবধান তার পূর্বে নয়।

চিত্রার্পিতের ন্যায় বিজয়সিন্ধ বিনয় সেনের দেওয়া খামে ভরা চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয় সেন বিদায় নিয়ে চলে গেল রাজ- অন্তপুর থেকে।

বিজয়সিন্ধ কিছুতেই বিনয় সেনের কথা অমান্য করতে সাহসী হলো না। চিঠিখানা অতি যত্নসহকারে রেখে দিল শেল্ফের মধ্যে। দশ দিন পর সে দেখবে কি লেখা আছে ওর মধ্যে।

❑

নূরী তার শিশু মনিকে নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক অনুচরসহ ঝিন্দের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে নিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। দস্যুকন্যা নূরীর বুকে অপরিসীম দুঃসাহস। সে নিজেও পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে একখানা রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে রাখল।

নিখুঁতভাবে নিজেকে পুরুষের বেশে সজ্জিত করেছিল নূরী। তাকে দেখলে কেউ নারী বলে চিনতে পারবে না। যতক্ষণ না সে কথা বলে।

নূরীর মনোভাব কেউ তাদের ওপর হামলা চালালে ওদের সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

কান্দাই নদীর বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে চলেছে নূরীর শ্যামচাঁদ বজরা। অতিদ্রুতগামী এবং অতি মজবুত বজরা এই শ্যামচাঁদ। দু'জন মাঝি আর একজন দাঁড়ি বজরায় ছিল—আর ছিল দস্যু বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। কায়েসও আছে এদের মধ্যে।

নূরী স্বয়ং বজরায় সবাইকে পরিচালনা করছিল। পথের নির্দেশ দিচ্ছিল কায়েস।

দিনরাত অবিরাম গতিতে শ্যামচাঁদ বজরা এগিয়ে চলেছে। বনহুরের সঙ্গে মিলনের আশায় নূরীর হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গের মত আনন্দের উৎস বয়ে চলেছে। ঝিন্দ শহরে বনহুর কি করছে ,কেন সে এতদিন ফিরে এলো না, এটাই নূরীর একমাত্র চিন্তা।

নির্জন নদীবক্ষে নূরী মনিসহ বজরার ছাদে বসে থাকে। গভীর নীল সচ্ছ জলের বুকে দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দের তালে তালে মনি অস্ফুট শব্দ করে কথা বলে। সুর করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান গায়, নূরীও যোগ দেয় তার গানের সুরে।

হাসে কায়েস আর অন্যান্য অনুচর। সকলের মনেই অফুরন্ত উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা।

কখনও বা মনিকে কোলে করে বজরার ডেকে এসে দাঁড়ায় নূরী। আংগুল বাড়িয়ে দেখায় আকাশে উড়ে চলা শুভ্র বলাকাগুলো।

মনির সামনের মাত্র ক'টা দাঁত উঠেছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতগুলো বের করে ফিক ফিক করে হাসে মনি।

নূরীও হাসে।

❑

ঝিন্দরাজ্য ছেড়ে যেতে কেন যেন আমার মনে ব্যথা জাগছে সুফিয়া। বজরার ডেকে দাঁড়িয়ে বলল মনিরা।

সুফিয়া দূরে অনেক দূরে ছেড়ে আসা ঝিন্দ শহরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—ঝিন্দের রাণী তুমি, ঝিন্দ ছেড়ে যেতে তোমার ব্যথা না লাগবে তো লাগবে কার? আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে।

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল— তোমার আনন্দ হবারই কথা ,কারণ তুমি ফিরে আব্বা-আম্মা ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলিত হবে, আর আমি---- নিঃসঙ্গ একা---- চাপাকান্নায় মনিরার কণ্ঠ ধরে এলো।

সুফিয়া আর মনিরার পেছনে কখন যে বিনয় সেন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি কেউ। মনিরা ফিরে তাকাতেই বিনয় সেন সরে গেল সেখান থেকে। মনিরা বুঝতে পারল তার কথাটা বিনয় সেনের মনে ব্যথা দিয়েছে। বিনয় সেনের চোখ দুটো যে অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছিল এটা লক্ষ্য করেছিল সে।

বজরার ডেকে দাঁড়িয়ে সুফিয়া আর মনিরার মধ্যে অনেক কথা হলো।

মনিরার মনে সর্বহারার বেদনা আর সুফিয়ার হৃদয়ে আপন জনের সঙ্গে মিলন আশার উদ্দীপনা।

দু'দিন দু'রাত অবিরাম চলার পর বিনয় সেনের বজরা এবার মধুমতি নদী বেয়ে এগুচ্ছে। নদীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী এই মধুমতি।

মধুমতি গভীর এবং প্রশস্ত নদী হলেও বেশ শান্ত। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে বজরাখানা এগিয়ে চলেছে।

রাত গভীর। বজরায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মনিরার। পাশে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সুফিয়া। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছে। আর ক'দিন পর পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হবে সে।

আর মনিরা চির অসহায় অভাগিনী। অহরহ মনের মধ্যে তার তুষের আগুন জ্বলছে। আহার-নিদ্রা একরকম তার নেই বললেই চলে। খেতে বসলে সবাইকে দেখায় সে খাচ্ছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই খেতে পারে না বা খায় না। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে, কিন্তু ঘুমায় না— ঘুমাতে পারে না।

সুফিয়া জানে মনিরা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু ঘুম আসে না। মিছামিছি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে বিছানায়। আজও তেমনই শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছিল সে, কখন যে একটু তন্দ্রামত এসেছিল খেয়াল নেই তার। হঠাৎ জেগে উঠল মনিরা, শুনতে পেল সে একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। পাশের ক্যাবিনে কে যেন কাউকে বলছে— চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের বজরা চালাবে, বুঝেছ?

বুঝেছি সর্দার।

আচ্ছা, তুমি যাও, বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দূরে লক্ষ্য রাখবে---

মনিরা কিছুতেই নিজকে শয্যায় ধরে রাখতে পারল না। বিদ্যুৎ গতিতে শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো, এ যে তার অতি কমানার অতি সাধারণ জনের গলার আওয়াজ--- তবে, তবে কি সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু কই না তো, ঐ তো, সেই কণ্ঠ যা তার মনের কন্দরে কন্দরে গাঁথা হয়ে রয়েছে। কোনদিন সে এই গলার স্বর বিস্মৃত হবে না— হতে পারে না।

বিনয় সেনের ক্যাবিন থেকে পুনরায় ভেসে এলো পূর্বের সেই আওয়াজ তুমি এবার যেতে পার।

মনিরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্যাবিনের দরজার আড়ালে আত্মগোপন করল, কিন্তু দৃষ্টি তার বাইরে অন্ধকারে নিবদ্ধ রইল। দেখল মনিরা, এক লোক অন্ধকারে বিনয় সেনের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে বজরার ছাদের দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

লোকটা বজরার ছাদে অদৃশ্য হতেই মনিরা বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। আসার সময় একবার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল মনিরা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে সুফিয়া। মনিরা অতি লঘু পদক্ষেপে অন্ধকারে গা

ঢাকা দিয়ে বিনয় সেনের ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে লোকটা বেরিয়ে যাওয়ায় দরজা কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল, মনিরা আলগোছে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেলল কক্ষের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে মনিরার হৃদয়ে একটা অনাবিল আনন্দের শিহরণ বয়ে গেলো, বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। বিনয় সেনের শয্যা তার কামনার, চির সাধারন রত্ন—তার স্বামী— দস্যু বনহুর! কোথায় সে বাবড়ি চুল, মুখে ছাটকরা দাড়ি। একজোড়া গোঁফ, বড় আঁচল, কোথায় সে বিনয় সেন!

মনিরা ভুলে গেল সব কথা, ভুলে গেল সে নিজেকে, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর বুকে। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর গভীর রাতে বিনয় সেনের রাজকীয় ড্রেস পরিবর্তন করে সবেমাত্র নিজের ক্যাবিনে এসে বিশ্রামের আয়োজন করছিল, এমন সময় অতর্কিতে মনিরাকে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠল। বুঝতে পারল আজ মনিরার নিকটে সব ফাঁস হয়ে গেছে। বনহুর মনিরাকে নিবিড় করে টেনে নিল বুকে, কিন্তু তারও কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। গভীর আবেগে মনিরার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে চলল সে। মুখটা নেমে এলো ওর চুলের ওপর।

মনিরার দু'চোখে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত অশ্রুধারা নেমে এলো। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল মনিরা। এই দেড়টি বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের জমান বেদনা অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল তার দু'নয়নে।

ফুলে ফুলে কাঁদছে মনিরা।

বনহুর নীরব। শুধু চিবুকটা বারবার ঘষছে মনিরার চুলে। বনহুরের চোখেও অশ্রু, ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে মনিরার মাথার ওপর।

মনিরা ইচ্ছামত কাঁদল, বনহুর একটু বাধাও দিল না, কারণ জানে সে এখন ওকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। বুকের মধ্যে ওর জমে রয়েছে ব্যথার পাহাড়— কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে ওর মনটা যদি একটু হাল্কা হয়!

অনেকক্ষণ কাঁদল মনিরা, তারপর এক সময় শান্ত হয়ে এলো।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ডাকল মনিরা। বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

হঠাৎ আগ্নেগিরির মত জ্বলে উঠল মনিরা, ক্রুদ্ধ বাষ্পভরা কণ্ঠে বলল— এত ছিল তোমার মনে! ছেড়ে দাও আমাকে— যেতে দাও এবার --

বনহুর ওকে আরও এঁটে ধরল, আবেগ মধুর কণ্ঠে বলল— মনিরা আমি নরাধম পাপী-- আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না জানি তবু মনিরা তোমার---

না না, আমি কিছুতেই আমার এ মুখ তোমাকে দেখাব না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

কেন মনিরা?

আমি অসতী ব্যভিচারিণী--

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দিল— আমাকে তুমি মাফ করে দাও মনিরা। মাফ করে দাও---

মনিরার হৃদয়ে আজ ক্ষুব্ধ অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিছুতেই সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারছে না। কেন তার স্বামী তাকে এমনভাবে নির্মম ব্যথা দিয়েছে। কেন সেদিন তাকে কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। কেন সে দিনের পর দিন আর তার সন্ধান নেয়নি। কেন সে বিচার করে দেখেনি সত্যি মনিরা অসতী— ব্যভিচারিণী কিনা। তারপর যদিও এতদিন পর তাকে খুঁজে পেয়ে পাপপুরী থেকে উদ্ধার করে আনল তবু কেন সে এতদিনও তার কাছে আত্মগোপন করে রয়েছে। সব ব্যথা আর দুঃখ আজ মনিরার হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। তাই সে ক্ষুব্ধ অভিমানে নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু মনিরা দস্যু বনহুরের বাহু দুটিকে এতটুকু শিথিল করতে সক্ষম হলো না। বনহুর বললো— মনিরা, বিনা কারণে আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। ভুল করেছি মনিরা, আমি ভুল করেছি-- বনহুর নতজানু হয়ে মনিরার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

অদ্ভুত এ দৃশ্য!

যে দস্যুর ভয়ে সমস্ত দেশবাসীর মনে আতঙ্কের সীমা নেই, যে দস্যুর জন্য গোটা পৃথিবীর পুলিশবাহিনী তটস্থ, যে দস্যু সব দস্যুর চেয়ে শক্তিমান, সেই দস্যুসম্রাট আজ, আজ একটা নারীর পদতলে উপবিষ্ট।

মনিরার পদপ্রান্তে যখন দস্যু বনহুর নতজানু হয়ে মাফ চাইছিল ঠিক তখন পাশের একটা ছোট জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল সুফিয়া। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল সে— একি দেখছে! বিনয় সেনের স্থানে কে ঐ অপূর্ব সুন্দর যুবক। আর মনিরাই বা এ ক্যাবিনে কেন! কি ওদের পরিচয়—আর কেনই বা যুবক মনিরার চরণতলে উপবিষ্ট। সুফিয়ার দু'চোখে রাজ্যের প্রশ্ন।

মনিরা স্বামীকে তাড়াতাড়ি তুলে নিল হাত ধরে। যত রাগ অভিমান মুছে গেল নিমিষে। করুণ ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল— একি করছ। তুমি আমার স্বামী, কেন তুমি আমাকে অপরাধী করছ।

মনিরার কথায় আড়ালে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল সুফিয়া। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় জাগল তার মনে— স্বামী, মনিরার স্বামী এই যুবক? তবে কি বিনয় সেন রূপে অন্য কেউ যার পরিচয় সে এখনও জানে না। সুফিয়ার হৃদয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে লাগল।

সুফিয়া পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্যাবিনের মধ্যে। এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না, অপূর্ব স্বর্গীয় সে দৃশ্য-- যুবকের বাহু বন্ধনে মনিরা, যুবকের ঠোট দু'খানা মনিরার মুখের ওপর ঝুকে পড়েছে।

এমন সময় বজরার সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। সুফিয়া আর দাঁড়াল না হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে তখন কি হবে। সুফিয়া এবার নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো। শয্যা গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু মনের অস্থিরতা কমলো না। কে এই যুবক যে এতদিন বিনয় সেনের রূপ ধরে তাদের মধ্যে রয়েছে। এভাবে তার আত্মগোপন করার অর্থই বা কি? একসঙ্গে নানা প্রশ্ন ধাক্কা দিয়ে চলল সুফিয়ার মনে।

রাত বেড়ে আসছে।

এতক্ষণও মনিরা ফিরে আসছে না, অস্বস্তি বোধ করে সুফিয়া—ভয় হয় হঠাৎ যদি বজরার কেউ ওদের এই মেলামেশা দেখে ফেলে। ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারিটাই না হবে। মনিরার প্রতিও ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠল সুফিয়ার। লুকিয়ে লুকিয়ে কবে সে ছদ্মবেশী বিনয় সেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিল। ভেতরে ভেতরে মেয়েটা নষ্ট চরিত্রা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ সুফিয়ার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল ঘৃণায়।

এমন সময় মনিরা অতি সন্তর্পণে ক্যাবিনে প্রবেশ করল। সুফিয়া ঘুমিয়ে আছে মনে করে নিজে ওর পাশে শুয়ে চাদরটা টেনে নিল গায়ে। মনে তার অফুরন্ত আনন্দ, কতদিন পর আজ সে স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। এখন

মনিরার মত সুখী কে! শত ব্যথা-কষ্ট নিমিষে মুছে গেছে, অনাবিল আনন্দস্রোতে ভেসে গেছে তার হৃদয়ের যত ব্যথা আর দুঃখ।

মনিরা শয্যা গ্রহণ করতেই সুফিয়া বিছানায় উঠে বসল, গম্ভীর তীব্রকণ্ঠে বলল— কোথায় গিয়েছিলে মনিরা?

মনিরা সুফিয়ার কথায় চমকে উঠল, তাহলে কি সুফিয়া সব জানতে পেরেছে! হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না সে, নীরব রইলো

সুফিয়া পুনরায় বলল— মনিরা, আমি সব জানি মিছামিছি কিছু গোপন করতে চেষ্টা করনা।

মনিরাও এবার শরীর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসলো, ক্যাবিনের নীলাভ আলোতে তাকালো সুফিয়ার মুখের দিকে। দেখল ঘৃণায় সুফিয়া ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

মনিরার মুখে ফুটে উঠল একটা হাসির রেখা। দীপ্ত উজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল। তখনও মনিরার শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে তার স্বামীর স্বর্গীয় পরশ। বুকের মধ্যে তখনও আনন্দের ছোঁয়া দোলা জাগাচ্ছে, সত্যই মনিরা আজ ধন্য! বলবে— সত্য কথাই বলবে, এতে আপত্তির কিছু নেই। মনিরা বলতে শুরু করল— সুফিয়া, জানি তুমি এখন যা শুনেছ বা দেখেছ তাতে আমার ওপর তোমার ঘৃণা জন্মাবার কথাই। যে কেউ এটা দেখলে আমাকে এ ভাবে প্রশ্ন করত। তাই তোমার এ সন্দেহ অহেতুক নয়।

সুফিয়ার মুখ তখনও গম্ভীর থমথমে। মনিরাকে সুফিয়া অনেক বিশ্বাস করে, ভালবাসে। সে ভাবতেও পারে না মনিরা নষ্ট চরিত্রা মেয়ে। তাই সে এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, যা তার মনকে বিষাক্ত করে তুলছিল।

মনিরা বলে চলল— সুফিয়া, তোমাকে আমি আমার জীবন কাহিনী সব বললেও একটা কথা এখনও বলিনি, আমি বিবাহিতা— আমি সন্তানের জননী--

সুফিয়া অস্ফুট শব্দ করে উঠল—সত্যি!

হাঁ সুফিয়া । শোন, আজ তোমাকে আমার সব গোপন কথা খুলে বলব, বলার পূর্বে তোমার মনের ভুল আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। যিনি তোমার আমার উদ্ধারকারী বিনয় সেন, তিনিই আমার স্বামী।

তোমার বিবাহিত স্বামী?

হাঁ সুফিয়া, আমার স্বামী।

তোমার স্বামীর এ ছদ্মবেশের কারণ কি মনিরা? তিনি বিনয় সেনের বেশে চেহারা এবং কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে আমাদের কেন এভাবে ছলনা করে চলেছিলেন?

সুফিয়া, তার বুদ্ধির শেষ নেই, বলছি সব শোন। ছদ্মবেশে না থাকলে তিনি আজ ঝিন্দের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের আবির্ভাব ঘটাতে পারতেন না। তুমি তো জান, ঝিন্দবাসী কিভাবে রাজা মঙ্গলসিন্ধের নিষ্ঠুর, নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছিল। আমার স্বামীর প্রাণে ঝিন্দবাসীদের এই করুণ পরিণতি দারুণ ব্যথা জাগিয়েছিল ,তাই তিনি নিজেকে গোপন রেখে দেশ ও দশের জন্য কঠিন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে তবেই আজ জয়ী হতে পেরেছেন। আমার কাছেও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি, জানতেন আমি তার কাজে বাধার সৃষ্টি করে বসব। সুফিয়া, কত কষ্টই না এতদিন ভোগ করেছেন তিনি। আমি এতটুকু সহায়তা তাকে করতে পারিনি বা করিনি--

মনিরা সব খুলে বলল, যদিও সে পূর্বে তার জীবন কাহিনী সুফিয়ার কাছে বলেছিল, কিন্তু সে স্বামী এবং সন্তান সম্বন্ধে সব গোপন করে গেছে। আজ একটা কথা ছাড়া সব কথাই বলল সুফিয়ার কাছে। তার স্বামীর আসল পরিচয় আজও মনিরা গোপন করে গেল।

মনিরার সব কথা শুনে সুফিয়া হেসে বলল— ভাগ্যবতী নারী তুমি মনিরা! তোমার মত স্বামীরত্ন পাওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা, আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না।

দু'বান্ধবী মিলে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হলো, তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল মনিরা আর সুফিয়া।

পাশের ক্যাবিনে ঘুমিয়ে পড়েছে দস্যু বনহুর। বিনয় সেনের অন্তর্ধান হয়েছে। মনিরার নিকটে আত্মগোপন করার জন্যই সে এই বেশে বজরায় অবস্থান করত। আজ অনাবিল এক আনন্দে বনহুরের হৃদয় পরিপূর্ণ। বহুদিন পর আজও সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

❑

দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে দূরে লক্ষ্য করছে দস্যু দুহিতা নূরী। পাশে দাঁড়িয়ে দস্যু বনহুরের অনুচর কায়েস।

বজরার মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে শিশুমনি।

অন্যান্য অনুচর সজাগভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ।নূরীর শরীরে পুরুষের ড্রেস। পিঠের সঙ্গে গুলিভরা রাইফেল ঝুলছে।

বজরাখানা মাঝনদী দিয়ে এগুচ্ছিল। শান্ত নদীর বুকে একটা জীবন্ত জীবের মত ঝুপঝুপ শব্দ করে চলেছে বজরাখানা।

হঠাৎ নূরী বলে উঠল— কায়েস, দেখ মনে হচ্ছে একটা বজরা এদিকে এগিয়ে আসছে।

কায়েস বলে ওঠে বজরা

হাঁ, কায়েস, বজরা বলেই মনে হচ্ছে। নূরী চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দূরে লক্ষ্য করে কথাটা বলল।

নূরীর হাত থেকে কায়েস দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখল সত্যি একখানা বজরা এগিয়ে আসছে এদিকেই। কায়েস বলল— আমার মনে হচ্ছে কোন যাত্রীবাহী বজরা।

নূরী চাপাকণ্ঠে বলে উঠল—আমারও তাই মনে হচ্ছে কায়েস। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও— আমরা এই বজরায় হানা দেব। নূরীর দু'চোখে খেলে গেল বিদ্যুতের চমকানি।

কায়েস নূরীর কথায় খুশি হল— এটাই তো কাজ। সর্দার না থাকায় আজকাল বনহুরের অনুচরগণ বেশ ঝিমিয়ে পড়েছে, কেমন যেন একটা শিথিলতা দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে। সর্দারের অবর্তমানে অনুচরগণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, আজ নূরীর কথায় আনন্দে নেচে উঠল কায়েসের মন। দস্যুবৃত্তিভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ধমনীর রক্তে।

নূরীর আদেশে কায়েস তার দলবলকে সম্মুখস্থ বজরায় হানা দেবার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল! নূরী নিজেও রাইফেল বাগিয়ে বজরার সম্মুখে এসে মাঝিদের নির্দেশ দিতে লাগল।

অতি সন্তর্পণে মাঝিরা দাঁড় চালিয়ে এগুতে লাগল। সম্মুখস্থ বজরার সবাই যে নিদ্রামগ্ন এটা বেশ বুঝতে পারল তারা। কারণ, বিপরীত বজরার গতি অতি মন্থর ছিল। মাত্র দু'তিনজন দাঁড় টেনে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

নূরীর বজরার দস্যুগণ প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রবল বজরাখানা নিকটবর্তী হলেই তারা আক্রমণ চালাবে।

নূরীর জীবনের একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। নূরী তখন সবে আট ন' বছরের ছোট বালিকা। পরনে ঘাগড়া, পায়ে মল, হাতে বালা, গলায়

ফুলের মালা, ছোট্ট কাঁকড়ান একরাশ চুল। একদিন নূরী তীর-ধনু নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বনহুর তখন পনের-ষোল বছরের কিশোর বালক, সেও নূরীর পাশে ছিল। হঠাৎ তারা গভীর বনের মধ্যে এসে পড়ল, এমন সময় একটা চিতাবাঘ আক্রমণ করল তাদের দু'জনকে। বাঘটা আচমকা বনহুরকেই আক্রমণ করে বসল। বনহুর যদিও হঠাৎ এমনভাবে চিতাবাঘের কবলে পড়বে বলে আশা করেনি, তবু নিজে তীর ধনু নিয়ে বাধা দিতে গেল কিন্তু ব্যর্থ হলো সে, পড়ে গেল মাটিতে। কিশোর বালক বনহুর একটা চিতাবাঘের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল, নূরী এই বিপদমুহূর্তে হতভম্ব হলো না, সে নিজের তীর দিয়ে বিদ্ধ করল চিতাবাঘকে। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল— কিছুক্ষণ ছট্ ফট্ করে মরে গেল বাঘটা। কারণ তীর-ধনুতে ছিল বিষ মাখান।

নূরীর জন্যই সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল বনহুর।

তা ছাড়াও নূরীর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যা তাকে করে তুলছে দুর্দান্ত-দুঃসাহসী।

আজ নূরীর ধমনীতে দস্যুরক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সমস্ত দস্যু অনুচরদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে নূরী। সম্মুখস্থ বজরাখানা মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে।

নূরী আর একবার বজরার মধ্যে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মনির মুখে চুমু দিয়ে দাসীকে বলল— খুব সাবধানে ওকে রাখবে। যতক্ষণ আমি বজরায় ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি মনিকে নিয়ে বাইরে যাবে না। কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেল নূরী।

ততক্ষণে ঐ বজরাখানা অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

আকাশে চাঁদ না থাকলেও অন্ধকার খুব জমাট ছিল না। বজরাখানা স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও বেশ বুঝা যাচ্ছিল।

নূরী আর তার দলবল অস্ত্র নিয়ে বজরায় পেছন দিকে লুকিয়ে রইল।

নূরীর ইঙ্গিতে তাদের বজরাখানাও সম্মুখস্থ বজরার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অতি নিকটে পৌছে গেছে।

এবার নূরীর বজরার গতি বেড়ে গেল, দ্রুত এগিয়ে গেল সামনের বজরার দিকে। যেইমাত্র দুটি বজরা পাশাপাশি হয়েছে অমনি নূরী দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বজরাখানার উপরে।

বজরার সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, নূরীর দল মাঝিদের বুকে রাইফেল চেপে ধরতেই তারা চুপ হয়ে পড়ল। বজরার ছাদে ছিল দু'জন, তাদের বুকেও রাইফেল ধরা হলো। কেউ কোন শব্দ করতে পারল না। অনুচরগণ অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকজনদের মজবুত করে বেঁধে ফেলল।

নির্জন নিস্তব্ধ নদীবক্ষে দু'খানা বজরার মধ্যে চলেছে একটা অদ্ভুত কার্যকলাপ। নূরীর অনুচরগণ বজরার সবাইকে বেঁধে ফেলল।

নূরীর আদেশে কয়েকজন প্রবেশ করলো সামনের ক্যাবিনে। দেখল দুটি যুবতী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। নূরী নির্দেশ দিল এদের দু'জনকে ঘুমন্ত অবস্থায় মুখে রুমাল বেঁধে আমাদের বজরায় উঠিয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে নূরীর অনুচরগণ ঘুমন্ত যুবতীদ্বয়ের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাত পা মজবুত করে বেধে ফেলল, তারপর নিয়ে গেল নিজেদের বজরায়।

অতি অল্প সময়ে এ সব হলো।

যুবতীদ্বয় অন্য কেউ নয়— মনিরা ও সুফিয়া।

এ বজরাখানি দস্যু বনহুরের।

এত কাণ্ড যখন হচ্ছে তখন বনহুর গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

বহুদিন সে এমন নিশ্চিন্তে ঘুমায়নি, আজ তাই আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল সে-- নীল তারাভরা আকাশ, মাঝখানে চাঁদ হাসছে। একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে একা। তার শরীরে সাদা ধবধবে মূল্যবান পোশাকে মণি মাণিক্য আর জরির কাজ করা। জ্যোস্নার আলোতে তার দেহের পোশাকগুলো ঝকঝক করছে। মাথায় পাগড়ী, পায়ে জরির বুটিতোলা নাগরা। বাগানের মধ্যে ফুর ফুরে হাওয়া বইছে। নানা রকম ফুলের সুবাস ভেসে আসছে বাতাসে। তার দেহের পোশাক হাওয়ায় উড়ছে, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে।

বনহুর এত সুখেও শান্তি পাচ্ছে না। বড় একা একা লাগছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে কারও অন্বেষণে। না, কোথাও কেউ নেই। বনহুর ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। জ্যোস্নার আলোতে ফুলগুলো দুলে দুলে যেন হাসছে, হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে বনহুরকে। সুন্দর অপূর্ব এ দৃশ্য। বনহুর হঠাৎ দেখল তার অদূরে একটা ক্ষুদ্র নৌকা ভেসে চলেছে চমকে উঠল বনহুর, নৌকায় একটি তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় কাঁকড়ানো এলো চুল, শরীরে সুন্দর ঝকঝকে শাড়ি। ডাগর ডাগর দুটি চোখ বনহুর ভাল করে তাকাল এ যে তার মনিরা। কোথায় যাচ্ছে মনিরা! বনহুর ছুটে গেল মনিরা হাসছে, নৌকাখানা আপনা-আপনি এগিয়ে এলো তার দিকে। মনিরা হাত বাড়াল বনহুর ওর হাত ধরে উঠে পড়ল নৌকাখানায়।

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল।

মনিরা নিজেকে সপে দিল বনহুরের বাহুবন্ধনে। তারাভরা আকাশে আলোর বন্যা। বনহুর আর মনিরা নৌকায় বসে হাসছে, হাওয়ায় দুলছে

তাদের নৌকাখানা। মনিরা নদীর স্বচ্ছ পানি তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে বনহুরের চোখে-মুখে।

হাতের পিঠে চোখে-মুখে পানি মুছে ফেলে হাসছে বনহুর। মনিরাকে পেয়ে আনন্দ তার ধরছে না।

বনহুর আর মনিরা যখন মনের খুশিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে দু'জনের আনন্দোচ্ছ্বাস, তখন হঠাৎ একটা কুমীর ভেসে উঠল বনহুর তাকিয়ে দেখল কুমীরটার পিঠে দাঁড়িয়ে নূরী। হাতে তার খোলা তরবারি। চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নূরী তাদের দিকে।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছে, বুঝাতে চেষ্টা করছে; কিন্তু পারছে না। নূরী তারবারি বাগিয়ে আসছে তাদের দিকে। মনিরা ভয়ে বনহুরকে আঁকড়ে ধরছে।

বনহুরও ওকে ধরে রয়েছে।

নূরী হঠাৎ তার তরবারি দিয়ে আঘাত করল ওদের দু'জনকে।

বনহুর হাত দিয়ে ধরে ফেলল নূরীর অস্ত্র। আশ্চর্য, বনহুরের হাত নূরীর অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হলো না। নূরী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় আঘাত করল, এবারও বনহুর নূরীর অস্ত্র থেকে বাঁচিয়ে নিল মনিরাকে।

নূরী যতই আঘাত করছে, বনহুর ততই তার আঘাত নীরবে রোধ করে যাচ্ছে। এবার হাসছে বনহুর, স্বপ্নঘোরেই হাসছে সে।

বনহুর যখন স্বপ্ন দেখছে ঠিক সে মুহূর্তে নূরী দলবল নিয়ে প্রবেশ করল তার ক্যাবিনে।

ক্যাবিনের স্বল্পালোকে দেখল নূরী, একটা লোক শয্যায় শুয়ে আছে, মুখটা তার ওদিকে ফেরান রয়েছে।

নূরী কথা না বলে ইংগিত করল ওকে বেঁধে ফেলতে।

নূরীর সঙ্গে কায়েসও দাঁড়িয়েছে, হাতে গুলিভরা বন্দুক।

কায়েসই প্রথম এগিয়ে এলো শয্যার পাশে। বন্দুকের নলের আগা চেপে ধরল ঘুমন্ত দস্যু বনহুরের পিঠে।

মুহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল বনহুরের, ফিরে তাকাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে কায়েস বিস্ময়ভরা অস্ফুট শব্দ করে উঠল— সর্দার। কায়েসের হাত থেকে খসে পড়ে গেল বন্দুকটা। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল ওর মুখমণ্ডল।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যান্য অনুচর ভীত হয়ে দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলেরই ত্রাহি ত্রাহি ভাব।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। বনহুরের চোখে মুখেও বিস্ময় ভাব, এগিয়ে গেল নূরীর দিকে। নূরীর শরীরে পুরুষ ড্রেস থাকায় চট করে চিনতে পারল না। নিকটে এসে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে হেসে উঠল হাঃ হাঃ হাঃ করে, তারপর বলল—নূরী তুমি!

নূরীর মুখ দিয়ে চট করে কোন কথা বের হলো না। চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বনহুরের মুখ থেকে তখনও মৃদু হাসির রেখামুছে যায়নি। বলল বনহুর— ক'দিন হলো কাজে নেমেছ?

নূরী একবার নিজের অনুচরদের মুখের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকাল বনহুরের মুখের দিকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলল— হুর, আমি জানতাম না এটা তোমার বজরা।

সাবাস নূরী, দস্যু বনহুরের বজরায় হানা দিয়ে তাকে বন্দী করতে চেয়েছিলে, এটা কম সাহসের পরিচয় নয়।

বনহুর এবার কায়েস ও অন্যান্য অনুচর যারা একটু পূর্বে তাকে বন্দী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, তাদের দিকে তাকাল— গম্ভীর কণ্ঠে বলল— বেরিয়ে যাও।

মুহূর্তে সবাই কক্ষ ত্যাগ করল।

বনহুর এবার আংগুল দিয়ে নূরীর নাকের নিচ থেকে সরু গোঁফ জোড়া খুলে নিল। তারপর হাত দিয়ে ওর মাথার পাগড়ীটা ঠেলে ফেলে দিল পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কোঁকড়ান চুল ছড়িয়ে পড়ল নূরীর পিঠে।

বনহুর আবার হাসল।

নূরী তাকাল ওর মুখের দিকে লজ্জা, সঙ্কোচ আর দ্বিধাভরা ভাব নিয়ে। কিছু বলতে গেল, ঠোট দু'খানা কেঁপে উঠল----

বনহুর বলল— কি বলতে চাও?

আমি ভুল করেছি হুর, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

ভুল তুমি করনি নূরী, ঠিকই করেছ। আমার অনুপস্থিতকালে তুমি আমার অনুচরদের মনে খোরাক দিচ্ছ, নাহলে ওরা হাঁপিয়ে পড়বে যে।

তুমি আমার সংগে ঠাট্টা করছ।

মৃদু হেসে বলল বনহুর— নূরী, ঠাট্টা আমি করিনি। সত্যই তুমি দস্যু দুহিতা। তোমার সাহস দেখে আমি খুশি হয়েছি নূরী।

হুর, তোমাকে হঠাৎ এভাবে পাব ভাবতেও পারিনি। নূরী বনহুরের জামাটা আঁকড়ে ধরে বুকে মাথা রাখল—হুর, তুমি জান না অমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারি না? কেন তুমি এতদিন ধরে আমাকে ছেড়ে দূরে রয়েছ?

বনহুর নূরীর চিবুকটা ধরে বলল—কত কাজ ছিল আমার, তাইত এত বিলম্ব হলো।

কাজ—কাজ—সব সময়ই তোমার কাজ। ঝিন্দে তোমার কি কাজ ছিল হুর?

সব কান্দাইয়ে ফিরে গিয়ে বলব।

ওরা কে হুর?

ওরা? কাদের কথা বলছ নূরী?

অভিমানভরা কণ্ঠে বলল.নূরী— ঐ যুবতী দু'জন?

তাহলে তাদের সন্ধান পেয়েছ?

কেন, আমার কাছে গোপন করে রাখতে চেয়েছ বুঝি?

না।

তবে যে ওকথা বলছ?

বলছি তুমি তাদের—

হাঁ, আমি ওদের দু'জনকে বন্দী করেছি।

বন্দী করেছ।

হাঁ হুর! দৃঢ় কণ্ঠস্বর নূরীর।

কিন্তু জান ওরা কে?

জানার কোন দরকার নেই, তবে এটুকু জানি ওরা তোমার বান্ধবী।

হাসল বনহুর— তোমার অনুমান ঠিক নূরী।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল নূরী— যেখানেই যাও, নারী নিয়ে তোমার কাজ।

গর্জে উঠল বনহুর—নূরী!

আমি মিথ্যা বলিনি, তার প্রমাণ ঐ যুবতী দু'জন।

নূরী, তুমি সত্যই জানতে চাও ওদের পরিচয়?

বল, আমি শুনতে চাই কে ওরা?

তবে শোন, একজন কান্দাইয়ের পুলিশ সুপারের কন্যা মিস সুফিয়া আর দ্বিতীয় যুবতী তোমার পরিচিত।

না, ওকে আমি চিনি না।

ভাল করে লক্ষ্য করলেই চিনতে পারতে।

আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই হুর যুবতীর পরিচয়।

তবে শোন নূরী, দ্বিতীয় যুবতী চৌধুরী কন্যা মনিরা।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল নূরী— মনিরা।

বলল বনহুর— চমকে উঠলে কেন? নূরী, আমি তাকে বিয়ে করেছি। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

উঃ! একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরল নূরী, তারপর তাকাল অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে বনহুরের মুখের দিকে— সত্যি বলছ?

হ্যাঁ নূরী। আমি তাকে দু'বছর আগে বিয়ে করেছি।

অস্ফুট কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল নূরী—দু'বছর আগে

হ্যাঁ।

আমাকে— তুমি বলনি কেন?

আমি জানি তুমি সহ্য করতে পারবে না, তাই বলিনি নূরী—

নূরী, আমি জানতাম তুমি সহ্য করতে পারবে না। বনহুর নূরীকে দু'হাতে টেনে নিল বুকের মধ্যে, গভীর আবেগে ডাকল নূরী। নূরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তার দেহে প্রাণ আছে কি নেই বুঝা যাচ্ছে না। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরল— আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস। তোমার প্রাণের চেয়ে তুমি আমাকে বেশি ভালবাস নূরী—আর আমি—আমি তোমাকে পরিহার করে চলি—

বনহুরের অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা নূরীর মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। বনহুর আবার ডাকল— নূরী—নূরী

নূরী নির্বাক—নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

পরবর্তী বই

দস্যু দুহিতা

দস্যু দুহিতা-১২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ভোরের শীতল হাওয়া শরীরে লাগতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল দস্যু বনহুরের। হাই তুলে শয্যায় উঠে বসল সে। গত রাতের ঘটনাগুলো একেরপর এক মনে পড়তে লাগলো— সর্বপ্রথম স্মরণ হলো নূরীর কথা, না জানি সে ঘুমোতে পেরেছে কিনা--

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ল— ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল রহমান— সর্দার----

বনহুর তাকে ডাকল— ভেতরে এসো রহমান—

রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই বনহুর বলল— এবার বজরা ছাড়ার আয়োজন কর।

রহমান মুখ তুলল, বিমর্ষ মলিন তার মুখ, বেদনাভরা গলায় বলল সে— সর্দার নূরী নেই।

চমকে উঠলো বনহুর বিস্ময়ভরা আরষ্ঠ কণ্ঠে বললো— নূরী নেই।

কখন যে নূরী বজরা থেকে চলে গেছে আমরা জানি না।

বনহুর ব্যস্তভাবে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়াল, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল— দুটো বজরাই খুঁজে দেখেছ?

হাঁ সর্দার, দুটো বজরাই খুঁজে দেখা হয়েছে।

এমন সময় দ্বিতীয় বজরায় নূরীর দাসী কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়াল সেখানে— হুজুর, মনি নেই। ওকে খুঁজে পাচ্ছি না।

চিত্রার্পিত্রের ন্যায় দাঁড়িয়ে বনহুর প্রতিধ্বনি করে উঠল— মনিও নেই।

দাসী ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলল— না।

বনহুরের চোখের সামনে সীমাহীন চিন্তাজাল জট পাকাতে শুরু করল। নূরী যখন গত রাতে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তখন তাকে অতি বিষণ্ন মলিন দেখাচ্ছিল। নূরী তারপর একটি কথাও বলতে পারেনি

তাকে। বনহুর নূরীকে সান্ত্বনা দেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে। নূরীর মুখে বনহুর কিছুতেই হাসি ফোটাতে পারেনি।

নূরীকে তার বজরায় বনহুর নিজে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। তারপর সবকিছু ঠিকঠাক করে রাতটুকুর মত কোন নির্জন স্থান দেখ বজরা বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিল সে নিজে। তখন কি বনহুর ভেবেছিল যে, নূরী পালিয়ে যাবে। তাহলে কিছুতেই সে বজরা বাঁধার আদেশ দিত না।

আজ নূরীর অভাব বনহুরের হৃদয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত করল। বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করে বলল—তাজকে নিয়ে কায়েস বোধ হয় কান্দাই পৌঁছে গেছে।

হাঁ সর্দার, তাজ আর দুলকী এতদিনে কান্দাই পৌঁছে গেছে। সর্দার, বজরা ভাসান হবে না?

না। যতক্ষণ নূরীকে খুঁজে না পাই ততক্ষণ বজরা এখানেই থাকবে। রহমান, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, এখনই যাব নূরীকে খুঁজতে।

রহমান আর বনহুরের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছে, তখন মনিরা এসে দাঁড়াল সেই ক্যাবিনে। মনিরা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে বেশ বুঝতে পারল তার মনোভাব স্বাভাবিক নেই। ইতোমধ্যে গত রাতের মেয়েটি–যে তাদের বন্দী করেছিল সে উধাও হয়েছে কথাটা তারও কানে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে মেয়েটিকে সামান্য দেখে মনিরা তাকে চিনতে পারেনি, কারণ তার শরীরে ছিল পুরুষের পোশাক। আজ সকালে একজন অনুচরের মুখেই শুনতে পেয়েছে, সেই যুবক পুরুষ নয়–নারী। এবং এটাও মনিরা জানতে পেরেছিল—তার নাম নূরী। সেই থেকে তার মনের কোণে যন্ত্রণার কাঁটা বিঁধছিল। তাই মনিরা ছুটে এসেছে, কিন্তু এসে স্বামীকে গম্ভীর ভাবাপন্ন বিষণ্ন দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

রহমান বেরিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে।

মনিরা স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল—এই গহন বনে নামবে তুমি?

হাঁ মনিরা।

কিন্তু...

উপায় নেই।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

তা হয় না।

কেন?

এসব বন অতি ভয়ঙ্কর স্থান। জানি না নূরী এতক্ষণ বেঁচে আছে কিনা, তাছাড়া তার কোলে শিশু মনি আছে।

বনহুরের কথায় মনিরার ভ্রূকুঞ্চিত হল, নূরীর পরিচয় সে জানত। কান্দাইয়ের পোড়োবাড়িতে নূরীর সঙ্গে একবার তার দেখাও হয়েছিল, তা ছাড়া এ নামটা বনহুরের মুখেও দু'এক দিন শুনেছিল মনিরা। আর এটাও মনিরা জানত, নূরী বনহুরকে ভালবাসে—শুধু ভালবাসে নয়, প্রাণ দিয়ে সে চায় ওকে। সেই নূরীর কোলে শিশুসন্তান— মনিরার মনে সন্দেহের দোলা লাগে।

বনহুর ততক্ষণে নিজের কাল দস্যু ড্রেস পরতে শুরু করেছে।

মনিরা নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কতদিন সে স্বামীকে এই ড্রেসে দেখেনি। বড় সুন্দর লাগছে বনহুরকে। স্বামীর বুকে মাথা রাখার জন্য মনিরার মন হাহাকার করে উঠল। কিন্তু এখন বনহুরের মনোভাব সম্পূর্ণ অন্য রকম। কোনদিকে যেন তার খেয়াল নেই। নূরী আর তার কোলের শিশুটাই যেন তার একমাত্র লক্ষ্য। অভিমানে ভরে উঠল মনিরার মন।

বনহুরের পোশাক পরা হয়ে গেছে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—মনিরা, তোমরা সাবধানে থাকবে। যতক্ষণ না ফিরে আসি বজরার বাইরে কেউ বের হবে না। একবার মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বনহুর দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

রহমান তার ড্রেস পরে রাইফেল হাতে কক্ষের বাইরে প্রতীক্ষা করছিল।

রহমান আর বনহুর বজরার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নদীতীরে নেমে গেল। মনিরা ছুটে এসে বজরার মুক্ত জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বনহুর আর রহমান গহন বনের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মনিরা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল বনহুরের শূন্য বিছানায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আজ মনিরার মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। তার নারী জীবনে কি এতই বিড়ম্বনা ছিল। স্বামী-সন্তান নিয়ে সবাই সুখের ঘর বাঁধে, ছোট একটা পরিচ্ছন্ন সংসার গড়ে তোলে, আর তার জীবনটা এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বামীভাগ্য তার সত্যি অতি অদ্ভুত, যা কোন নারীর ভাগ্যে হয় না। দস্যু বনহুরকে স্বামীরূপে পাওয়া—এ চরম, সার্থক নারী জীবনের পরম উপলব্ধি। কোন মেয়ে যা কোনদিন কল্পনা করতে পারে না বা পারেনি, বজরার জীবনে সেই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেই দুর্লভ রত্ন সে লাভ করেছে এর

চেয়ে আর কি সে কামনা করতে পারে। কিন্তু তবুতো মনিরার জীবন আজ অভিশপ্ত, এত পেয়েও না পাওয়ার হাহাকারে তার অন্তর জর্জরিত, নিষ্পেষিত। এর চেয়ে না পাওয়াটাই ছিল তার জীবনের সান্ত্বনাময় একটি দিক। এখন পেয়ে না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা বড়ই অসহ্য তীক্ষ্ণ। মনিরা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

গোটা রাতের ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় সুফিয়ার শরীর ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে উঠেছিল, অঘোরে ঘুমাচ্ছিল সে। ঘুম ভাঙতেই মনিরাকে না দেখে উঠে বসে বিছানায়।

বজরার জানালাপথে তখন ভোরের সূর্যের আলো মেঝেতে এসে পড়েছে। সুফিয়ার মনে গত রাতের ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে ভেসে উঠল। মনে পড়ল মনিরার কথাগুলো, বিনয় সেন মনিরার স্বামী কাল রাতে মনিরা তার কাছে সব কথাই খুলে বলেছে। তবে কি আজ ভোর হতে না হতেই মনিরা তার স্বামীর কক্ষে গিয়েছে? হয়তো তাই, বহুদিন পর স্বামীর সন্ধান পেয়েছে বেচারী, তদুপরি যা তা স্বামী নয়! পুরুষের মত পুরুষ বটে বিনয় সেন। মনিরার স্বামীভাগ্য অতি গৌরবময়।

সুফিয়ার মনে একটা অতৃপ্ত কামনা উঁকি দিয়ে গেল। শিহরণ জাগল তার হৃদয়ে। নিশ্চয় এখন তার স্বামীর বুকে মাথা রেখে অনাবিল শান্তি অনুভব করছে। স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার নারীজীবন সার্থক করে তুলেছে। এ দৃশ্য না জানি কত মধুর, স্বর্গীয়, সুফিয়া উঠে দাঁড়াল, চুপি চুপি পাশের মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে উঁকি দিল। কক্ষে দৃষ্টি পড়তেই সুফিয়ার কল্পনাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলো— একি, কোথায় সেই মহাপুরুষ– মনিরাই বা বিছানায় লুটিয়ে অমন করে কাঁদছে কেন?

সুফিয়া কিছুক্ষণ নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে ডাকল—মনিরা।

সুফিয়ার কণ্ঠস্বরে মনিরার কান্নার বেগ যেন আরও বেড়ে গেল। বাঁধভাঙা স্রোতধারার মত বাধা বন্ধনহীনভাবে নেমে এলো মনিরার অশ্রু।

সুফিয়া মনিরার পাশে এসে বসল, সস্নেহে পিঠে হাত রেখে ডাকল—মনিরা, কি হয়েছে বোন?

মনিরা কি বলবে, বলার মত কিছুই যে নেই। অন্তরে যে না পাওয়ার বহ্নিজ্বালা অহরহ ধিকধিক করে জ্বলছে তা বলার নয়। নারীর স্বামীই যে একমাত্র সম্বল।

সুফিয়া পুনরায় জিজ্ঞেস করল—মনিরা কি হয়েছে তোমার ভাইজানই বা কোথায়?

মনিরা এবার মুখ তুলে তাকাল। দু'চোখে তার অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। অন্তরের ব্যথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার কোমল সুন্দর মুখমণ্ডলে।

কতদিন কত সাধনার, কত প্রতীক্ষার পর দেখা পেয়েছিল মনিরা তার অবাধ্য দেবতার। পেয়েছিল ক্ষণিকের জন্য—সমস্ত অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করার সময়ও পায়নি মনিরা! যতই পেয়েছে ততই ভয় হয়েছে এই বুঝি হারাই।

মনিরার দুশ্চিন্তা সত্যে পরিণত হলো—রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এক মহাবিচ্ছেদের দাবানল তার অন্তরকে জ্বালিয়ে দিল অগ্নিদগ্ধ লৌহ-শলাকার মত। সেই বিচ্ছেদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। এই অজানা-অচেনা গহন বনের কোণে অশরীরী আত্মার অদৃশ্য হাতছানি তার সমস্ত কামনাকে চূর্ণ করে দিল! নূরী-নূরীই তার সমস্ত পাওয়াকে মুছে নিয়ে চলে গেছে।

মনিরা বলল—সে চলে গেছে!

সুফিয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল—চলে গেছে! ভাই জান গেছে কোথায়, কেন?

মনিরা সোজা হয়ে বসে বলল—ঐ যুবকবেশী নারী অন্য কেউ নয়—সে নূরী। নূরী চলে গেছে, তারই সন্ধানে গেছে সে।

নূরী! কে এই নারী?

ওর পরিচয় আমি জানি না, সুফিয়া। এইটুকু জানি, সে আমার স্বামীকে ভালবাসে।

ভাইজানকে সে ভালবাসে।

হাঁ।

কিন্তু সে যে তোমার।

আমার স্বামী, কিন্তু তাকে ধরে রাখার সামর্থ আমার নেই। ধূমকেতুর মত ক্ষণিকের জন্য তাকে কাছে পাই, আবার কোথায় মিলিয়ে যায় কোন স্বপ্নরাজ্যের মায়াময় জগতে। সুফিয়া, আমি বড় হতভাগিনী।

সুফিয়া মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে। সেও তো নারী—নারীর হৃদয়ের ব্যথা তার অন্তরেও নাড়া দেয়। যদিও সে স্বামী কি জিনিস আজও তা উপলব্ধি করেনি, কিন্তু বুঝতে তো পারে। মনিরার অন্তরের ব্যথা তাই

সুফিয়ার মনে এক অভিনব দোলা জাগায়। বলে সে—মনিরা, একদিন তোমার পাওয়া সার্থক হবে। আর সে চলে যাবে না তোমার পাশ থেকে, সেদিন তুমি ওকে অক্টোপাশের মত সর্বক্ষণ ঘিরে থেক।

কিন্তু সেদিন বুঝি কোনদিন আমার জীবনে আসবে না, আমি বুঝি কোনদিন ওকে তেমন করে পাব না সুফিয়া।

ছিঃ এত অবুঝ হলে কেন মনিরা? সে গেছে—হয়তো এক্ষুণি ফিরে আসবে। তছাড়া ঐ যে নূরী না কে বললে, এলোই বা সে তার সঙ্গে, কিন্তু তার কি অধিকার আছে তোমার স্বামীর উপর? সে হয়তো তাকে ভালবাসে, তাই বলে স্ত্রীর দাবী নিয়ে কোন সময় তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না।

সুফিয়ার কথায় মনিরা সান্ত্বনা খুঁজে পায় না, একটা অজ্ঞাত ব্যথা গুমরে ফেরে তার মনের কোণে। মনিরা জানে নূরী বনহুরের আস্তানায় থাকে। বনহুরকে নিজের করে পাবার জন্য নূরীর চেষ্টার ক্রটি নেই। নানাভাবে নানা কৌশলে বনহুরকে সে বশীভূত করার চেষ্টা করছে। বনহুর মুখে না বললেও সে দিন কান্দাই বনের পোড়োবাড়ির ঘটনাতেই বেশ অনুমান করে নিয়েছে যে নূরী বনহুরের জন্য উন্মাদ। নিশ্চয়ই নূরী ওকে পাবার জন্য সদা ব্যাকুল থাকে। পুরুষ কতক্ষণ সংযত রাখতে সক্ষম হবে? তবে কি নূরীর কোলে শিশুসন্তান সে তারই...স্বামীর না না, এই চিন্তা তাকে পাগল করে ফেলবে। মনিরা সব বলতে পারে কিন্তু, স্বামীর সম্বন্ধে এ কথাটা কি করে সুফিয়ার কাছে বলবে? অসম্ভব।

সুফিয়া বলে উঠল—কোন চিন্তা করো না। তোমার স্বামী অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ। তার কাছে বন্য জন্তুর শক্তিও হার মানে। নিশ্চয়ই এসে যাবে। চলো আমরা কক্ষে যাই।

উঠে দাঁড়ায় মনিরা, আঁচলে অশ্রু মুছে বলে চলো।

❑

গহন বন।

চারদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন আর ভয়াবহ থমথমে ভাব। নূরী শিশুমনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে এগুচ্ছে! কোন বাধাবিঘ্নই আজ তার পথ রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর।

বেলা অনেক হয়েছে।

নূরী ক্ষুধায় কাতর হলেও তেমন কিছু আসে যায় না। মনির জন্য যত ভাবনা। মনি ক্ষুধায় বার বার নড়েচড়ে উঠছে। লক্ষ্মী ছেলে বলে এখনও তেমনি নীরব রয়েছে। মনি দুষ্ট হলেও বেশ ধীর শান্ত ছেলে, হাজার ক্ষুধা পেলেও সে চিৎকার করে কাঁদত না। ক্ষুধার সময় একটা অদ্ভুত শব্দ করত মনি, আর মাঝে মাঝে দু'হাতের মুঠি দিয়ে চোখ ঘষতো।

নূরীর অজানা ছিল না এসব।

ছোট্ট নাদুস নুদুস কচি কচি হাত দু'খান দিয়ে মনি যখন নাকমুখ ঘষে একটা অস্ফুট ভাঙ্গা শব্দ করতে থাকে, তখন নূরীর মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। নিজের জন্য তার চিন্তা হচ্ছে না, চিন্তা তার মনিকে নিয়ে।

ঘন বনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে নূরী। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ায় ঘন বনের জমাট অন্ধকার কিছু কিছু হালকা হয়ে এসেছে।

একটা গাছের তলায় এসে বসল নূরী।

মনি তখন বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। হবে না কেন, মনি তো কচি শিশু। হঠাৎ নূরীর কানে আসে একটা জলধারার ক্ষীণ শব্দ। নূরী উঠে দাঁড়ায় মনিকে বুকে নিয়ে—সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে থাকে। কিছুদূর এগুতেই নূরীর নজর পড়ে অদূরে ঘন বনের মাঝখান দিয়ে একটি পাহাড়িয়া ঝর্ণা কুল কুল করে বয়ে চলেছে।

মনিকে কোলে করে নূরী ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়াল।

নির্মল স্বচ্ছ জলধারা। মনিকে হাঁটুর উপরে বসিয়ে নূরী ঝর্ণার পানি দক্ষিণ হাতে তুলে ওর মুখে ধরল। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল মনি, প্রাণভরে পানি খেল। নূরী নিজেও ঝর্ণার শীতল স্বচ্ছ পানি খেয়ে ক্লান্তি আর তৃষ্ণা দূর করলো।

পানি পান শেষ করেই ফিরে দাঁড়াল নূরী, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চমকে উঠল। একদল ভীমকায় লোক তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলের হাতেই শরকি, বল্লম আর তীর ধনুক।

নূরীর মুখমণ্ডল মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হলো। ওরা যে কোন দস্যুদল এটা সহজেই অনুমান করে নিল নূরী। কারণ এ পোশাক এবং এ ধরনের লোকজন তার অপরিচিত নয়। শিশু মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে ভীতকণ্ঠে বলল—তোমরা কে? কি চাও?

একজন ঐ দলের সর্দার বা দলপতি হবে সে এগিয়ে এলো নূরীর পাশে, নূরীর শরীরে পুরুষের ড্রেস অথচ তার নারী কণ্ঠ শুনে কিছুটা আশ্চর্য হলো, বলল,—তুমি কে?

নূরী চট করে বলল—আমি দস্যু দুহিতা।

লোকটার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। অচেনা-অজানা একটা গহন বনের বাসিন্দা হলেও দলপতি যে তার কথাটার মর্ম বুঝতে পারল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে খুশিই হলো দলপতি, বলল এবার—দস্যু দুহিতা মানে দস্যুকন্যা।

হাঁ, আমি দস্যুকন্যা।

এ বনে কোথা থেকে এলে তুমি?

পথ ভুলে।

ও তোমার কে?

আমার....আমার সন্তান।

এবার দলপতি কঠিন কণ্ঠে বলল—জান এ বনের একচ্ছত্র অধিপতি ডাকু ভীম সেন।

নূরী হেসে নিজেকে স্বচ্ছ করে নিতে চাইল, ভয় পেলে এখন তার চলবে না। সেও যে সে মেয়ে নয়, দস্যুরক্ত তার ধমনিতেও প্রবাহিত। গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে—তুমিই বুঝি ডাকু ভীম সেন?

না, আমরা ডাকু ভীম সেনের অনুচর। আমি এই দলের নেতা।

ও, তুমি ভীম সেন নও। হাসবার চেষ্টা করল নূরী, বলল তোমাদের দলপতির কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?

যে এতক্ষণ নূরীর সঙ্গে আলাপ করছিল, সে ভীম সেনের প্রধান অনুচর রঘু ডাকু।

রঘু বলল—তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হলাম দস্যু দুহিতা। যে ভীম সেনের নাম শুনে মানুষের হৃদকম্প শুরু হয়, সমগ্র আন্দামান রাজ্যের মানুষ যার ভয়ে তটস্থ, সেই ভীম সেনের সঙ্গে তুমি সেচ্ছায় দেখা করতে চাও? সত্যি তুমি সাহসী রমণী। তারপর নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল রঘু ডাকু—একে সঙ্গে করে নিয়ে চলো আমাদের আখড়ায়।

নূরী ভেতরে ভেতরে যে, ভীত না হয়েছে তা নয়, কিন্তু মুখোভাবে সে ভয়ের চিহ্ন ফুটতে দিল না—ডাকাত দলের সঙ্গে এগিয়ে চলল নূরী। পুরুষদের তালে তালে পা ফেলে এগুতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার, তবু মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে চলতে লাগল।

কত বন, জঙ্গল আর ছোট ছোট নদীর মত ঝর্ণা পেরিয়ে এগুলো তারা।

গহন বন ছাড়িয়ে তারা একটা পাহাড়িয়া জঙ্গলায় এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার ঝাপসা আলো তখন পৃথিবীর বুকে নববধুর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

মস্তবড় একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াল রঘু ডাকু ও তার দলবল।

রঘু তিন বার হাতে তালি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জনের মত একটা শব্দ হলো। নূরী বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সম্মুখস্থ গুহার মুখের প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। পাহাড়টা যেন কোন অদৃশ্য ইংগিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অল্পক্ষণেই গুহার মুখ একটা সুড়ঙ্গপথে পরিণত হলো। রঘু তার দলবল নিয়ে প্রবেশ করল সুরঙ্গপথে। নূরীও রয়েছে তার সঙ্গে।

দস্যু বনহুরের সঙ্গিনী নূরী, নিজেও সে দস্যু দুহিতা—কিন্তু এসব যেন তার কাছে নিজেদের আস্তানার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো।

নূরী রঘু ডাকুর সঙ্গে এগুচ্ছে।

পেছনে ডাকাতদল সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে।

নূরীর হৃদয়ে ভয়-ভীতি আর দুশ্চিন্তা জোট পাকাচ্ছিল। সে নারী–এতগুলো পুরুষের সঙ্গে একা। না এসে কোন উপায় ছিল না, জোর করেই ওকে ধরে আনত, কাজেই স্বেচ্ছায় এসেছে সে। এখন কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। নারী হলেও সে অন্যান্য মেয়ের মত দুর্বল প্রাণ নয় এত সহজেই ভীত হলে তার চলবে কেন?

নূরী মনিকে কোলে নিয়ে রঘু ডাকুর সঙ্গে এগুচ্ছে।

পাথর কেটে যেন সুড়ঙ্গপথটা তৈরি করা হয়েছে।

কিছুটা এগুনোর পর রঘুর অনুচরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে সুড়ঙ্গের দু'পাশে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নূরী অবাক হয়ে তাকাল পেছনে।

রঘু ডাকু বলল—এরপর আর যাওয়া চলবে না, শুধু তুমি চলো আমার সঙ্গে।

নূরীর মনে কেমন একটা ভয় দোলা দিয়ে গেল। যা হোক, এতগুলো লোক থাকায় তবু একটু সাহস ছিল তার মনে। কেমন যেন দুর্গম পথ। গাঢ় অন্ধকার কিছুটা দূরীভূত করেছে সুড়ঙ্গের মাঝে মাঝে জ্বলন্ত মশালের আলো।

রঘু ডাকু আর নূরী, কোলে তার শিশু মনি, দু'জনেই এগুচ্ছে।

বেশ কিছুটা চলার পর সামনে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে, শিউরে উঠল নূরী। সুউচ্চ পাথরাসনে ভয়ঙ্কর জমকালো একটা লোক বসে রয়েছে। তার দু'পাশে দু'জন ঐ রকম চেহারা লোক সুতীক্ষ্ণধার বল্লাম হাতে দণ্ডায়মান।

দেয়ালের দু'পাশে দুটো মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। মশালের আলোতে ডাকাত দলপতি ভীম সেনের জমকালো চেহরার জমাট পাথরের মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মস্ত একজোড়া গোঁফ। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

নূরী দস্যু দুহিতা হলেও এই ভীষণ চেহারার লোকটার সামনে ভীত হয়ে পড়ল।

রঘু ডাকু কিছু বলার পূর্বেই গর্জন করে উঠল ভীম সেন— এ কে?

রঘু নতমস্তকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—দস্যু দুহিতা।

দস্যু দুহিতা! কি রকম?

এ পুরুষ নয়—নারী।

তা এখানে কি করে এলো?

পথ ভুল করে আন্দামানের বনে এসে হাজির হয়েছিল।

আর তুমি তাকে ধরে এনেছ?

রঘু মস্তক অবনত করে রইল।

ভীম সেন পুনরায় হুংকার ছাড়ল—তা ওর কাছে কি পেলে?

রঘু এবারও নত মস্তকে রইল কোন জবাব দিল না।

ভীম সেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলল—জান এখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ?

চোখ তুলে তাকাল রঘু, নিজের ভুল বুঝতে পেরে হকচকিয়ে গেল, বললো—আমার কোন দোষ নেই সর্দার। এই মেয়েটি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল।

তাই তুমি নিয়ে এলে? এত সাহস তোমার! এ জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

রঘু আর্তনাদ করে উঠল—সর্দার!

নূরী তখন কেমন যেন সংজ্ঞাহারার মত হয়ে পড়েছে। একি হলো! রঘু ডাকু তার জন্য মৃত্যুবরণ করবে। একটা প্রাণ যাবে তার জন্য?

নূরী নিশ্চুপ ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ বলে উঠল—বাবা, আমি নারী হলেও তোমাদের কোন অন্যায় বা ক্ষতি করব না। আমাকে তুমি মেয়ে বলেই জেন।

হঠাৎ নূরীর কণ্ঠে বাবা সম্বোধন ভীম সেনের কঠিন হৃদয়ে আলোড়ন জাগাল। নিঃসন্তান ভীম সেন জীবনে কোনদিন বাবা ডাক শুনেনি। আজ এ ডাক তাকে অভিভূত করে ফেলল। কিছুক্ষণ ভীমসেন নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইল নূরীর দিকে—শিশু মনি তার কোলে, ক্ষুধায় কাতর মনি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

ভীম সেন এবার বলে উঠল—বাবা! কে তোমার বাবা?

তুমি।

না না, আমার কোন সন্তান নেই।

নূরী করুণ কণ্ঠে বলল—আমি তোমার সন্তান, দয়া কর বাবা, আমার জন্য রঘুকে হত্যা কর না। তার চেয়ে তুমি আমাকেই হত্যা কর।

ভীম সেন কি যেন ভাবতে লাগল। ডাকাত হলেও সে তো মানুষ! তার দেহেও তো রক্ত-মাংস রয়েছে। নূরীর কথাগুলো ভীম সেনের অন্তরে সাড়া জাগাল।

ভীম সেন চিন্তা করছে।

রঘু মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

নূরী ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে ভীম সেনের মুখের দিকে। দু'চোখে তার করুণ অসহায় চাহনি। নূরীর কোলে ঘুমন্ত শিশু মনি।

ভীম সেন এবার বলে উঠল—মা, আমি তোমার কথায় রঘুকে ক্ষমা করে দিলাম। জীবনে ভীম সেন কাউকে ক্ষমা করেনি, এই তার প্রথম ক্ষমা।

রঘু মুখ তুলে তাকাল।

নূরীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে জেগে উঠলো মনি। ক্ষুধায় কেঁদে উঠল সে।

ভীম সেন কোনদিন শিশু দেখেনি, মনির অপরূপ চেহারা তাকে স্নেহকাতর করে তুলল। বলল ভীম সেন—রঘু, ওদের নিয়ে যাও। শিশুর ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার ব্যবস্থা কর।

রঘুর দু'চোখে আনন্দের ছটা ফুটে উঠল। সর্দারকে রঘু জানে—তার কঠিন আদেশের নড়চড় নেই। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে মুক্তি পেল রঘু! নূরীকে লক্ষ্য করে বলল সে—চলো।

রঘুর পেছনে পা বাড়াল নূরী।

এই নির্জন বনে নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় যে কোন আশ্রয়ই তার কাছে খোদার দান বলে মনে হলো।

❑

গোটা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বনহুর ও রহমান নূরী আর শিশু মনিকে পেল না। শক্তিমান বনহুর আর বলিষ্ঠ হৃদয় রহমান এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন হলো। ললাটে ফুটে উঠল গভীর চিন্তারেখা—তবে সে গেল কোথায়? বাঘ-ভালুকে কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? কিন্তু তাহলেও তার জামাকাপড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যেত। রক্ত-মাংসের দাগ দেখতে পেত। নূরী কি তবে বেঁচেই আছে। কিন্তু কোথায় সে অদৃশ্য হয়েছে? ক্লান্তকণ্ঠে বলল বনহুর—রহমান, নূরীকে বুঝি আর আমরা ফিরে পাব না!

রহমান নতমস্তকে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল সর্দার, হতাশ হবার কিছু নেই। নূরী সাধারণ মেয়ে নয়—সে দস্যু কন্যা, তার ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছে দস্যুরক্ত। এত সহজে সে নিজেকে বিলীন হতে দেবে না।

কিন্তু এই গহন বনে, এক, নিরস্ত্র, একটি শিশু তার কোলে, কি করে সে নিজেকে রক্ষা করবে বা করতে পারে? এ বনে নানা হিংস্র জন্তুর আনাগোনা রয়েছে। বনহুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ গর্জন ভেসে এলো—বাঘের ভীম গর্জন।

বনহুর আর রহমান তটস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। সামনে ঝোপটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল বনহুর—ঐ দেখ।

রহমান সেদিকে চেয়ে দেখল—একটা ভয়ঙ্কর বিরাট বাঘিনী ঝোপটার পাশে শুয়ে আছে। পাশে কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে।

রহমান মুহূর্তে রাইফেল উদ্যত করে ধরল।

বনহুর রহমানের রাইফেলের মাথাটা হাত দিয়ে নত করে দিয়ে বলল—মের না রহমান।

সেকি সর্দার। মনে মনে আশ্চর্য হলো রহমান। যে সর্দার মানুষের বুকে রাইফেল ছুড়তে দ্বিধাবোধ করে না, আজ সেই সর্দার একটা হিংস্র জন্তুর বুকে গুলি ছুড়তে বারণ করছে? অবাক না হয়ে পারল না রহমান।

বনহুর রহমানের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল—কি হবে ওকে মেরে। অযথা কতগুলো অসহায় বাচ্চার কষ্ট হবে।

রহমান কোন জবাব দিতে পারল না।

বনহুর বলল—চল রহমান, সাবধানে এখান থেকে সরে পড়ি। এখন বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। হাঁ, একেই বলে মায়ের প্রাণ।

বনহুর আর রহমান অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারল না। একটা বন্য শুকর সুতীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত বিস্তার করে তীর বেগে ছুটে এলো।

মুহূর্তে রহমানকে ঠেলে দিয়ে বনহুর রাইফেল উদ্যত করে গুলি করল—অব্যর্থ লক্ষ্য বনহুরের, শুকর ছুটে আসতে গিয়ে গুলির আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে আবার উঠতে গেল কিন্তু ততক্ষণে বনহুরের রাইফেলের আর একটা গুলি শুকরের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গেল। আর সে উঠতে পারল না।

বনহুর আর রহমান বনে বনে আরও সন্ধান করল, কিন্তু নূরীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

রহমান লক্ষ্য করল, তার সর্দারকে আজ বড় বিষণ্ন, বড়ই উদাসীন মনে হচ্ছে। নূরীর ব্যথা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এক সময়!

ঘন বনের মধ্যে চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে হিংস্র জন্তুর গর্জন। রহমান বলল—সর্দার!

জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছ। কিন্তু নূরীকে এই গহন বনে একা রেখে আমি যাব কোন্ প্রাণে?

সর্দার, রাত হয়ে আসছে। এখানে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। নূরীর সন্ধান করে তাকে পাওয়া এখন দুরাশা।

হাঁ, দুরাশাই বটে। গহন বন। অন্ধকার রাত। কোথায় আমি তাকে খুঁজব রহমান?

খুঁজে আর ফল হবে না সর্দার। ওর অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়ে গেছে।

নূরী তবে নেই বলতে চাও?

না, কারণ এই হিংস্র জন্তু ভরা গহন বনে তার বেঁচে থাকাটা অসম্ভব সর্দার!

রহমান!

হাঁ সর্দার, নূরী আর বেঁচে নেই।

বনহুরের মুখমণ্ডল সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও এটা বেশ বুঝতে পারল রহমান, তার সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠেছে। সর্দার নূরীকে কতখানি ভালবাসে, রহমান হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করল।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে নিজেকে সংযত করে নিল বনহুর। তারপর বলল। চল রহমান।

সর্দার!

হাঁ চল, আর বিলম্ব করে লাভ নেই।

বনহুরের প্রতীক্ষায় মনিরা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বজরার সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে অপেক্ষা করছিল সর্দারের। সন্ধ্যা ঘনিয়ে যখন রাতের অন্ধকার নেমে এলো তখন সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। এই অজানা-অচেনা গহন বনে শুধুমাত্র দু'টি প্রাণী কি করে এতক্ষণ হিংস্র জন্তুর কবল থেকে বাঁচতে পারে।

মনিরা কায়মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগল। মনিরার ব্যথাকরুণ অবস্থা দেখে সুফিয়ার চোখেও পানি এলো। সান্ত্বনা দিতে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠও রোধ হয়ে এলো? সত্যি যদি আর ওর স্বামী ফিরে না আসে।

কিন্তু যখন বনহুর বজরায় ফিরে এলো তখন দু'টি বজরার সব লোকই খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু নূরী ফিরে না আসায় সবাই মর্মাহত হলো।

ছুটে এলো মনিরা আর সুফিয়া।

সুফিয়া থমকে দাঁড়াল, আজ প্রথম সে বনহুরকে কাল ড্রেসে সজ্জিত দেখল—অপরূপ সুন্দর লাগছে বনহুরকে। সুফিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল বনহুরের সুন্দর মলিন-বিষণ্ন মুখখানার দিকে।

মনিরা ছুটে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরল—কেন তুমি এত বিলম্ব করলে?

বনহুর মনিরার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল সে অতি সাবধানে।

স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করে মনিরার হৃদয় গুমড়ে কেঁদে উঠল। কি করে ঐ মুখে হাসি ফুটাবে ভাবতে লাগল সে।

সুফিয়া ধীরে ধীরে সরে পড়ল সেখান থেকে।

এ সময় এখানে থাকা তার উচিত হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বলল বনহুর—নূরীকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

মনিরা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—সে চলে গিয়েছিল কেন?

জানি না।

আচ্ছা, একটা কথা তুমি আমায় বলবে?

বল।

ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ...

মনিরার কথা শেষ হয় না, রহমান এসে দাঁড়ায় দরজার বাইরে—সর্দার!

বনহুর বলে—এসো।

রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করে বলল—সর্দার, যা হবার হয়ে গেছে। এখানে বিলম্ব করা আর উচিত হবে না।

একথা আমিও চিন্তা করেছি রহমান, বজরা ছাড়ার আদেশ দেব কিনা ভাবছি।

সর্দার, একে অজানা-অচেনা দেশ, তারপর এসব বন রাত্রিকালে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। নানা হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

আচ্ছা, তুমি বজরা ছাড়তে বল।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

মনিরা তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। সে মুখ যেন বিষাদে ভরা। মুক্ত জানালা দিয়ে দূরে অন্ধকারে নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বনহুর। বুকের মধ্যে তার একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে কষ্ট হলো না মনিরার।

মনিরা কোন কথা বলতে পারল না বা বলার সাহস পেল না, এ সময় বনহুরকে বিরক্ত করতেও তার মন চাইনো।

মনিরা চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল, বনহুর ডাকল—মনিরা!

মনিরা থমকে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না।

বনহুর মনিরাকে টেনে নিল কাছে, বলল—তুমি কি প্রশ্ন করেছিলে না?

না, কিছু না! আমি যাই এখন।

না মনিরা, তুমি যেও না। আরও ঘনিষ্ঠভাবে মনিরাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে বনহুর।

আগে এবং পেছনে দু'খানা বজরা এগিয়ে চলেছে।

মনসা নদী পেরিয়ে যোগিনী নদীর বুক চিরে এগুচ্ছে বনহুরের বজরা দু'খানা।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে মনিরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'ফোঁটা অশ্রু তখনও চিকচিক করছে মনিরার চোখের কোণায়। মনিরা ঘুমিয়ে গেলেও দস্যু বনহুরের চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে মনিরার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে? এখনও তার হাতখানা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। অতি মৃদু সঞ্চারণ হচ্ছিল মনিরার চুলে! বনহুর গভীর চিন্তায় মগ্ন। ফিরে গেছে সে অতীতে তলিয়ে যাওয়া একটা দিনে---- বালক বনহুর অস্ত্রশিক্ষা করছিল দস্যু কালু খাঁর কাছে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রচালনা করেছিল বনহুর। বৃদ্ধ কালু খার দু'চোখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। হাস্য-উচ্ছলতায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, মাঝে মাঝে অস্ফুটধ্বনি করছে সে—সাবাস! সাবাস বেটা! সাবাস!

বালক বনহুরের শিরায় শিরায় তখন উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, হৃদয়ে অফুরন্ত উন্মাদনা। চোখমুখ প্রতিভাদীপ্ত, তীব্র উত্তেজিত। অস্ত্রশিক্ষার প্রচণ্ড পিপাসা তাকে উম্মাদ করে তুলেছে। বালক বনহুরের হাতের প্রচণ্ড আঘাতে এক সময় কালু খার অস্ত্র ঝন ঝন করে খসে পড়ল।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে কালু খাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরল বালক বনহুরকে বুকের মধ্যে।—সাবাস বেটা! সাবাস!

কালু খাঁ যখন বনহুরকে বুকে টেনে আদর করছিল তখন তার একজন অনুচর এসে দাঁড়াল—সর্দার দলবল এসে গেছে।

কালু খাঁ বনহুরকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—চল।

যতক্ষণ কালু খাঁ আর বনহুরের লড়াই হচ্ছিল ততক্ষণ একটা পেয়ারা গাছের ডালে পা দুলিয়ে পেয়ারা খাচ্ছিল আর গুরুশিষ্যের খেলা দেখছিল নূরী। গলায় দুলছিল তার একটা বনফুলের মালা।

কালু খাঁ তার অনুচরদের সঙ্গে চলে যেতেই নূরী লাফ দিকে গাছ থেকে নেমে ছুটে এলো বনহুরের পাশে, তৃপ্তির হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল। নিজের গলা থেকে মালাটা খুলে নিয়ে পরিয়ে দিল বনহুরের গলায়—হুর তোমার জয় হয়েছে—সে জন্য এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর মালাটা নেড়ে দেখল।

এমনি আরও কত কথা, কত দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল বনহুরের চোখের সামনে।

ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কাটছিল বনহুর ও নূরী ।

কিশোর বনহুর আর কিশোরী নূরী। উচ্ছল হাসিতে মেতে উঠেছে দু'জন। সাঁতার কাটতে কাটতে এ-ওর দিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। তাদের পাশে নদীর বুকে সাঁতার কাটছিল শুভ্র রাজহংসীর দল। হঠাৎ একটা বাচ্চা হাঁস ভেসে চলে গিয়েছিল স্রোতের টানে। নূরী হাঁসটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়, কিন্তু সে নিজেও স্রোতের মুখে পড়ে হাবুডুবু খায়। এই ডুবে যায়, আর কি!

বনহুর লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেল। প্রখর স্রোত ধারায় অতি কষ্টে নূরীকে সেদিন বাঁচিয়ে নিল বনহুর। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নূরীর আনন্দ আর ধরে না। কি দিয়ে যে সে বনহুরকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। দু'হাতে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে নিষ্পাপ নূরী দুটো চুম্বনরেখা এঁকে দিয়েছিল ওর গণ্ডে। হেসে বলেছিল নূরী—আমার জীবনের বিনিময়ে কি দেব তোমাকে তাই---

নূরীর স্বাভাবিক স্বচ্ছ হাসির সঙ্গে সেদিন তাল মিলিয়ে হেসেছিল বনহুর। আজ বারবার সেই দিনগুলোর স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল বনহুরের মানসপটে।

নূরীর জন্য আজ বনহুরের হৃদয় হাহাকার করে কেঁদে উঠল। মনিরার ঘুমন্ত মাথাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল নিজের বালিশের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াল, অতি সন্তর্পণে ক্যাবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বজরাখানা।

কয়েকজন পাহারাদার নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। মাঝিদের দাড়ের ঝুপঝাপ শব্দ হচ্ছে।

বনহুর বজরার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, অদূরে দাঁড়িয়ে রহমান। গুলিভরা রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

বনহুর ডাকল—রহমান!

রহমান এগিয়ে এলো অন্ধকারে—সর্দার!

তাদের অলক্ষ্যে অদূরে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

বনহুর বলছে–নূরী কি সত্যই বেঁচে নেই রহমান।

ঐ হিংস্র জীবজন্তু ভরা ভয়ংকর জংগলে বেঁচে না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার মন বলছে সে বেঁচে আছে।

কিন্তু গোটা বন তো আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি সর্দার?

এমন কোন জায়গায় সে আছে যেখানে আমরা যেতে পারিনি বা যাইনি।

হাঁ তা হতে পারে সর্দার।

রহমান!

বলুন সর্দার।

আমরা সেই বন ছেড়ে কতদূর এসেছি বলতে পার?

পারি সর্দার। দশ মাইলের বেশি হবে।

দশ মাইল!

তারও বেশি হবে।

ভোর হলে আবার আমরা ফিরে যাব।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেন?

বহুদিন সবাই বাড়িছাড়া, মাঝিরা কেউ আর ফিরে যেতে চাইবে না।

আমার হুকুম, বজরা ফিরাতেই হবে।

সর্দার!

হাঁ রহমান।

নিজের ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল বনহুর, মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।

বনহুর ফিরে তাকাতেই মনিরা দৃঢ়কণ্ঠে বলল—না, এ বজরা আর ফিরবে না।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলল—মনিরা!

সবাই তোমার দাপটে ভীত হতে পারে, কিন্তু আমি নই, তোমরা সবাই ফিরে যেতে পার কিন্তু আমাকে এই মাঝনদীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

মনিরা!

হাঁ। আমি শপথ করেছি, এই নদী থেকে আমি কিছুতেই পেছনে ফিরে যাব না। আমার জীবনের সব মুছে নিয়ে গিয়েছিল ঐ সিন্ধি নদী, ঐ মনসা–ঐ যোগিনী নদী। না, না, আমাকে আজ তোমরা পেছনে নিয়ে যেতে পারবে না। হয় মনিরাকে বিসর্জন দেবে, নয় নূরীকে।

মনিরা!

সব আমি সইতে পারি কিন্ত—আকুলভাবে কেঁদে ওঠে মনিরা।

বনহুর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। দস্যুপ্রাণ হলেও মনিরার ব্যথা তাকে অস্থির করে তোলে, এগিয়ে গিয়ে মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা স্বামীর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে—জান, তোমার জন্য আজ আমি সর্বহারা। পিতা-মাতা, মামা-মামী, আত্মীয়-স্বজন, আমার একমাত্র নয়নের মনি নূরকেও আমি হারিয়েছি শুধু তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্য—আর আমি কোন ব্যথা সহ্য করতে পারব না। এই নদীতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমাকে আমি মুক্তি দেবো। যাও, যেখানে খুশি চলে যেও, কেউ থাকবে না তোমাকে বাধা দেবার জন্য।

বনহুর গভীর আবেগে মনিরাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। কোন কথা বলতে পারল না সে।

কেঁদে কেঁদে মরিয়ম বেগম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। আগে যা একটু সংসার দেখতেন এখন তাও দেখেন না। ঝি-চাকর নিজেরাই যতটুকু পারে গুছিয়ে নিয়ে করে। নকিব পুরোন চাকর— সেই মাতব্বর হয়ে সবাইকে চালনা করে, আদর করে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব বাইরের যত দেখাশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি না থাকলে আজ বুঝি চৌধুরী বাড়ির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত।

মরিয়ম বেগম নিজে কিছুই দেখেন না, দেখার চেষ্টাও করেন না। কত টাকা আসছে, কত টাকা ব্যয় হচ্ছে সব সরকার সাহেব হিসেব রাখেন। একদিন সরকারের অনুপস্থিতিতে মরিয়ম বেগম কোন কাজে সিন্দুক খুললেন। সিন্দুকের তালা খুলে বেগম সাহেবার চক্ষুস্থির! সিন্দুকে টাকা আর ধরছে না। ব্যাংকেও তাঁদের প্রচুর টাকা জমা রয়েছে, জানেন তিনি। আবার সিন্দুকেও টাকা রাখার জায়গা নেই!

এত টাকা, আনন্দ হবার কথা কিন্তু মরিয়ম বেগমের খুশির বদলে দু'চোখে অশ্রু ভরে উঠেছিল। আছে অনেক কিন্তু খরচ করার লোক নেই।

একদিন মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে ডেকে বলে দিলেন, আবর্জনাগুলো সিন্দুকে জমা করে রেখে কি হবে সরকার সাহেব, তার চেয়ে কিছু বিলিয়ে দিন দিন-দুঃখীদের মধ্যে যারা না খেয়ে আছে তারা বাঁচবে।

সরকার সাহেব নতমুখে বলেছিল সেদিন—চৌধুরীবাড়ি থেকে কোনদিন কোন দীন-দুঃখী রিক্তহস্তে ফিরে যায় না বেগম সাহেবা। যা দেবার, যা তাদের প্রয়োজন, আমি দিয়ে দেই।

তবে অতসব হলো কি করে?

বেগম সাহেব,. এ সংসারে খানেওয়ালা তো মাত্র আপনি আর ঐ চাকর-বাকরের দল। খরচ তো তেমন কিছু হয় না। ড্রাইভারকে মাসে তার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি। বাগানের ফুলগাছ আর নতুন করে লাগান হয় না, তবু মালীকে তার মাসিক টাকা ঠিকভাবেই বুঝিয়ে দেই।

বুঝেছি, আমার সংসারে ডুমুর ফুল এসেছে।

সত্যি তাই বেগম সাহেবা।

সেদিন রাত হয়ে গেছে। মরিয়ম বেগম নিজের ঘরের দাওয়ায় একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। পাশে অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সরকার সাহেব। সংসার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলছিল। একথা-সে কথার মাঝে রাত বেড়ে আসে।

নবিক এসে বলে—বেগম সাহেবা ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ঘরে চলুন। বাতের ব্যথাটা আবার বেশি হবে ক্ষন।

হবে না হবে না। তোরা আমার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আমাকে আরও বাঁচিয়ে রাখতে চাস?

সরকার সাহেব বলে উঠলেন—না বেঁচে যে কোন উপায় নেই বেগম সাহেবা—যতদিন আপনার মনির ফিরে আসে ততদিন আপনাকে এ বোঝা বইবার জন্য বেঁচে থাকতেই হবে।

কিন্তু বেঁচে থাকা কি আমার নিজস্ব ইচ্ছা সরকার সাহেব?

যদিও নয়, তবু আপনাকে সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

তারপর কি হবে?

মনির ফিরে আসুক।

সে কি কোনদিন মানুষ হয়ে ফিরে আসবে!

আসবে—সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না। গম্ভীর মধুময় একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়—মা!

কে—কে—আমার মনি, আমার মনি!

ততক্ষণে বনহুর মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। মনিরা তার পেছনে। মনিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে মরিয়ম বেগমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে—মামীমা!

আমার মা মনিরা! কোথায় ছিলি মা এতদিন?

মনিরা মামীর বুকে মুখ গুঁজে ছোট বালিকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এতদিনের জমানো ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে তার দু'চোখে।

নকিব এমনভাবে প্রকাশ্যে কোনদিন বনহুরকে দেখেনি। আজ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল বনহুরের দিকে। খুশিতে নকিবের দু'চোখে আনন্দের বান বয়ে যায়। যেমন মা তেমনি তার সন্তান। তাই তো বেগম সাহেব সর্বদা এমন হাঁ হুতাশ করেন।

মনিরাকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে খুশীর ফোয়ারা বইল। ঝি-চাকর সবাই যেন তাদের হারানো ধন ফিরে পেয়েছে।

মরিয়ম বেগম কিছুতেই পুত্রকে ছেড়ে দিলেন না।

রাতে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন— মনির, এবার তোর সংসার তুই বুঝে নে। আয় দেখবি আয়—পুত্রের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন মরিয়ম বেগম সিন্দুকের পাশে। ডালা খুলে বললেন দস্যুতা আর তোকে করতে হবে না। নিয়ে যা, আমাকে রেহাই দে মনির।

মা!

না না, তোর কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। বল, তুই আমাকে রেহাই দিবি কি না?

মা, তুমি কি মনে কর আমি অর্থের লালসায় দস্যুবৃত্তি করি?

তা না হলে তুই কি চাস? রক্ত! রক্ত চাস? নে, আমার বুকের রক্ত তুই চুষে নে। আমার বুকের রক্ত নিয়েও যদি তুই ক্ষান্ত হোস। দেয়ালে মাথা ঠুকে চলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর শক্ত হাতে ধরে ফেলল—মা, মা, মাগো।

না, আমি কোন কথাই শুনব না।

মনিরা এতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। নীরবে দেখা ছাড়া কিইবা করার আছে তার। মনিরা জানে, কোন বাধাই তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারে না। বাধা বন্ধনহীন জলস্রোতের মত তার গতি।

মরিয়ম বেগমের ললাট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

মায়ের এই দৃশ্য বনহুরকে বিচলিত করে তুলল। মায়ের পদ তলে বসে পড়ে বলল— মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা। শত শত অসহায় দীন হীন জনগণ। যারা এখনও তোমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে। বল কোনটা আমাকে করতে বল? সংসার না দেশ মাতার সেবা?

কেন, দেশ ও দশের সেবা করার কি অন্য কোনো উপায় নেই? কাঁদতে কাঁদতে বললেন মরিয়ম বেগম।

আছে কিন্তু তোমার অর্থে ক'দিন কুলাবে মা?

তাই বলে তুই অন্যায়ভাবে টাকা সংগ্রহ করে--

মা?

জানি তুই কি বলতে চাস?

মা, তোমার সন্তান কোনদিন অন্যায়ভাবে কারও টাকা কেড়ে নেয়নি, নেবেও না। যাদের অসৎ পথে উপার্জিত অর্থে সিন্দুক ফেঁপে ওঠে, তাই আমি হালকা করে দেই। তাদের অপ্রয়োজনীয় অর্থগুলোর সৎগতি করি। এতে তাদেরও কোন ক্ষতি হয় না। আর যারা দিনের পর দিন না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছে, যারা লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করতে অক্ষম, যাদের রুক্ষ চুলে মাসের মধ্যে একটি দিন তেল পড়ে না, আমি তাদের হাতে তুলে দেই সেই অর্থ— এতটুকু উপকার যদি হয় তাদের? মা বল, একি আমার অন্যায়?

মরিয়ম বেগম কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাবেন, পুত্রের কথাগুলোই বুঝি তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে! শত শত দীন-দুঃখীর ব্যথাকরুণ মুখ ভেসে উঠেছে বুঝি তার মনের গহনে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রুমালে মায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলল— তোমার চোখে অশ্রু আমাকে পাগল করে ফেলবে। মা, তুমি যা বলবে তাই আমি করব। বল, বল আমাকে তুমি কোনপথে যেতে বল?

মরিয়ম বেগম ধ্যানগ্রস্তের মত নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর সোনার সংসার— পুত্র, পুত্রবধু, তাদের সন্তান-সন্ততি, আর এক দিকে দেশের শত শত দীন হীন অসহায় জনগণ কোন দিকটা তিনি চান, কোন দিকটাকে তিনি মনের মনিকোঠা থেকে গ্রহণ করবেন।

কোন জননী না চায় পুত্র, পুত্রবধু তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে সংসার বাঁধতে? কিন্তু বিবেকের কাছে পরাজিত হন মরিয়ম বেগম। নিজের দিকে দেখতে গিয়ে দেশের অসহায় জনগণের কথা ভুলে যাবেন কোন মুখে, কোন প্রাণে? একমাত্র পুত্রের বিনিময়ে তিনি যদি শত শত পুত্রের দুঃখব্যথা মুছে ফেলতে পারেন তাহলে তাঁর মত সুখী কে! কি হবে তার একার সুখ আর আনন্দ দিয়ে— দেশের অগণিত নর-নারী যদি ক্ষুধায় মরে যায়, তাদের হাহাকারে দেশ যদি অশান্তিময় হয়ে ওঠে, তবে সে সুখ কাম্য নয় মরিয়ম বেগমের।

তিনি বলে উঠলেন—মনির, যা— যা তুই, আমি তোকে ধরে রাখতে চাই না।

মা, তুমি রাগ করেছ?

না, রাগ আমি করিনি— করতে পারি না। তোকে আমি পেটে ধরলেও তুই আমার একার সন্তান নস্। শত শত মায়ের ছেলে হয়ে জন্মছিস। তোকে কি আমি ধরে রাখতে পারি।

মা, মাগো। বনহুর মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট শিশুর মত আনন্দধ্বনি করে উঠল।

❑

মনিরাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো বনহুর তার বজরায়। একটা দিকে নিশ্চিত হলো বনহুর। এবার সুফিয়া। পুলিশ সুপার আহমদ সাহেবের আধুনিক কন্যা সুফিয়া। তাকে তার পিতামাতার নিকটে পৌছে দিয়ে তবে নিশ্চিত হবে সে। কিন্তু মনিরাকে যত সহজে পৌঁছে দিতে পেরেছে তত সহজ নয় সুফিয়াকে পৌঁছান। অনেক চিন্তা করে তবেই এ কাজ সমাধা করতে হবে। এতদিন পর সুফিয়া যদি সহজভাবে বাড়ি ফিরে যায়, নিশ্চয়ই তাকে সমাজ সহজে গ্রহণ করবে না। পিতামাতার মনেও একটা সন্দেহের দোলা খোঁচা দেবে। হয়তো নিষ্পাপ সুফিয়ার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুফিয়াকে শুধু তার পিতামাতার নিকটে পৌছানই বড় কাজ নয়—সুফিয়া যে সত্যিই একটা সতী মেয়ে, সে কথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে তাদেরকে।

এ-কথা সুফিয়াই বলেছিল মনিরার কাছে। বলেছিল, মনিরা তুমিতো যাচ্ছ, তোমার স্বামী তোমাকে যাচাই করে নিয়েছেন। সকল সন্দেহ থেকে তুমি মুক্ত। আর আমি, যদিও— আমি মা-বাবার নিকটে যাচ্ছি বা যাব কিন্তু তারা কি আর আমাকে আগের মত স্বচ্ছ মন নিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন? আমি কেমন করে সবাইকে বুঝাব আমি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক।

মনিরা সব বলেছিল বনহুরের কাছে, এ কথাও বলেছিল —সুফিয়াকে শুধু পৌছে দেবার দায়িত্বই তোমার নয়, ওর জীবনে যেন কোন কলঙ্কের কালিমা লেপন না হয়, একাজও তোমাকে করতে হবে।

কাজেই সুফিয়াকে শুধু পৌছে দেওয়াই নয় ওর বিরাট একটা পরিণতি নির্ভর করছে দস্যু বনহুরের ওপর। লোকসমাজ জানে—দস্যু বনহুর শুধু দুর্দান্ত দস্যুই নয়, সে লম্পট নারীহরণকারী।

বনহুর আধুনিক যুবকের বেশে সুফিয়াসহ পুলিশ সুপারের বাড়ির গেটে হাজির হলো।

নতুন ছোট্ট কুইন গাড়িখানা গেটে পৌছতেই সেলুট করে সরে দাঁড়ালো পাহারাদারগণ।

গাড়ি–বারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই সুফিয়া নেমে ছুটে গেল অন্দরমহলে। একমাত্র কন্যার অন্তর্ধানে মিঃ আহমদ ও মিসেস আহমদ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। মিসেস আহমদ একরকম প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। সুফিয়া ছুটে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে ডাকল—আম্মা! আব্বা!

মুহূর্তে মিঃ আহমদ ও মিসেস আহমদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। আকাশের চাঁদ যেন ফিরে পেলেন তাঁরা।

সুফিয়া পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল— আব্বা। আব্বা।

মিঃ আহমদ কন্যাকে সস্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরে বললেন— মা কোথায়—কোথায় গিয়েছিলি?

আব্বা, সব বলব— সব শুনবে। সুফিয়া আবার মায়ের বুকে মুখ লুকায়, কতদিন পর আজ সে মাকে পেয়েছে। সুফিয়া তারপর বলে— আব্বা, তুমি বাইরে যাও। আমার রক্ষাকারী যিনি তিনি গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বলছিস কি মা? তাকে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? চল দেখি— বেরিয়ে যান আহমদ সাহেব।

হঠাৎ সুফিয়ার নজর চলে যায় পিতার বিছানার একপাশে। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাখানা পড়ে রয়েছে সেখানে। একটা ছবিতে দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুফিয়া। এ যে মনিরার স্বামীর ছবি! যিনি তাকে এইমাত্র পৌছে দিতে এসেছেন। সুফিয়া তাড়াতাড়ি পত্রিকাখানা হাতে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল একি! সুফিয়ার চোখ ছানাবড়া হলো।

মিসেস আহমদ বললেন— সুফিয়া, তোকে হরণ করার অপরাধে দস্যু বনহুরের নামে

সুফিয়া অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল —মা!

কি হলো, কি হলো সুফিয়া?

সুফিয়া মায়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু কয়েক পা এগুতেই কানে ভেসে এলো পাশের কক্ষে পিতার চাপা কণ্ঠস্বর, ফোনে আলাপ করেছন তিনি। মিঃ হারুন এই মুহূর্তে পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে আসুন। আমার হলঘরে দস্যু বনহুর—এরপর আর শোনার অপেক্ষা করল না। ছুটে গেল হলঘরে, কিন্তু একি, হলঘর শূন্য। ব্যস্তভাবে চারদিকে

তাকাল সুফিয়া। কই কোথাও তো তিনি নেই। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল সোফার দিকে। ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ে রয়েছে সোফার ওপর।

সুফিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

"বোন সুফিয়া, তোমার মঙ্গলই আমার কামনা। তোমার নিষ্পাপ পবিত্র জীবন চিরসুন্দর এবং সুখের হোক।"

তোমার ভাইয়া
—দস্যু বনহুর।

মিঃ আহমদ কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—ও কই—

কে?

যে তোমাকে চুরি করে নিয়ে ফেরত দিয়ে গেল।

আব্বা! তুমি ভুল বুঝেছ।

সুফিয়া, দস্যু কোনদিন সাধু হয় না। তোমার নারীজীবন কলঙ্কময় করে এসেছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাধুগিরি দেখাতে!

এই দেখ সে মানুষ নয়—ফেরেস্তা।

সুফিয়া!

হাঁ, তুমি এই কাগজের টুকরাখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবে। সে আমাকে নিজের বোনের মত মনে করত। তাছাড়া তার চেষ্টাতেই আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি। রক্ষা করেছেন তিনি আমাকে, রক্ষা করেছেন নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব। তিনি আমার বড় ভাইয়ের সমান।

মিঃ আহমদ কন্যার হাত থেকে কাগজের টুকরাখানা নিয়ে তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলেন মিঃ হারুন ও তাঁর পেছনে পুলিশ ফোর্স। সকলের হাতে উদ্যত রাইফেল। মিঃ হারুনের হাতে রিভলবার।

ব্যস্তকণ্ঠে বললেন মিঃ হারুন—স্যার, কোথায় সেই নরপিচাশ?

মিঃ আহমদ বললেন—পালিয়েছে!

মিঃ হারুন সুফিয়াকে দেখে চোখমুখে বিস্ময় এনে বললেন— ইনি।

মিঃ আহমদ ছোট্ট কাগজের টুকরাখানা মিঃ হারুনের হাতে দিলেন—পড়ে দেখুন।

হিঃ হারুন চিরকুটখানা পড়ে পরপর কয়েকবার তাকালেন বনহুরের লেখা চিঠিখানা ও সুফিয়ার মুখের দিকে, তারপর বললেন আশ্চর্য!

সুফিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলল— আশ্চর্য নয়, সবই সত্য। আপনারা বসুন, আমি সব ঘটনা বলছি।

মিঃ আহমদ বললেন হাঁ, এখনও সুফিয়ার মুখে কোন কথাই আমাদের শোনা হয়নি।

মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সকে ইংগিতে বাইরে যেত বললেন।

পুলিশ ফোর্স তৎক্ষণাৎ কক্ষত্যাগ করল।

মিঃ আহমদ বললেন— বসুন। নিজেও আসন গ্রহণ করলেন আহমদ সাহেব।

সুফিয়া নিজে একটা আসনে বসে বলতে শুরু করল— আব্বা আমাকে যখন গুণ্ডাদল কৌশলে হাত-পা-মুখ বেঁধে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গেল, তখন আমি মনে করেছিলাম, নিশ্চয়ই আমি দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছি এবং আমি ভয়ে মুষড়ে পড়লাম, কেঁদে কেটে অস্থির হলাম। এমন কি ওরা যত টাকা চায় তাই দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

তারপর? বললেন মিঃ হারুন?

সুফিয়া তখনও বলে চলেছে— তবু আমাকে ওরা মুক্তি দিল না। আমাকে এমন এক কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে— যে কক্ষে আরও কয়েকজন যুবতী ছিল। তাদের সঙ্গে আমিও সেই অন্ধকার কক্ষে বন্দী অবস্থায় রইলাম। তারপর গভীর রাতে আমাদের কয়েকজনকে হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা নৌকায় উঠান হলো।

মিঃ আহমদ অস্ফুট ধ্বনি করলেন— নৌকায়?

হাঁ, আব্বা, সেই নৌকা অবিরত কয়েকদিন চলার পর অজানা-অচেনা এক শহরে গিয়ে পৌছল। সেখানেও গভীর রাতে আমাদের পূর্বের মতই অবস্থা করে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠান হলো। তারপর গাড়িখানা উঁচুনীচু পথ বেয়ে চলতে লাগল। আমাদের শরীরে সে ঝাঁকুনির ব্যথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। তবু সহ্য করতে বাধ্য হলাম। তাছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।

উঃ! শয়তান নরপিচাশের দল— আহমদ সাহেব দাঁতে দাঁত পিষে বললেন।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন—দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া এ কারও কাজ নয়। আমারা জানি, সে যেমন হৃদয়হীন দস্যু তেমনি নারী—

সুফিয়া কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল—আপনি ভুল করছেন। তাঁর মত হৃদয়বান দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—

মিঃ হারুন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন— মিস সুফিয়া, আপনি তার উপরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তার—

. না, আপনি চুপ করে শুনুন— তারপর বলবেন।

মিঃ আহমদ বলেন, হাঁ ইন্সপেক্টার, আগে ওর কথা শোনা যাক, তারপর সাব বুঝা যাবে। আচ্ছা তুমি বল মা।

আব্বা, আমি এক নারীহরণকারী গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছিলাম যারা ঐ ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছিল।

বল মা, তারপর কি হলো?

হাঁ আব্বা, আমাকে একটা পুরানো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গিনীগণকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সে বাড়ি নারী ব্যবসায়ী এক মহিলার। আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না সে কি রকম স্থান। সেই মহিলার চেহারা মনে হলে আজও হৃদয় ভয়ে শিউরে ওঠে। ভীমকায়, বিরাটদেহী এক মহিলা। যার প্রভাব গোটা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। ওই মহিলার অনুচরগণ বিভিন্ন দেশ থেকে নারী এবং শিশুদেরহরণ করে নিয়ে যেত সেখানে। সেখান থেকে চালান হত বিভিন্ন জায়গায়। আমাকে সেই মহিলা একটি বিরাট কক্ষে বন্দী করে রাখল। সেখানে আমার মত আরও কত যে যুবতী ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছে, তার শেষ নেই। প্রতি রাতে ওই মহিলার কাছে লোক আসত। যাকে পছন্দ হত উচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে যেত। আমিও একদিন বিক্রি হলাম। ঝিন্দের রাজকুমারের এক গুণ্ডা অনুচর আমাকে কিনে নিয়ে গেল।

অবশ্য এ কথা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। মাতাল ঝিন্দ রাজকুমারের জঘন্য মনোবৃত্তি থেকে সেদিন আমার উদ্ধার ছিল না, যদি এই মহান ব্যক্তি আমাকে বাঁচিয়ে না নিতেন, সুফিয়া আনমনা হয়ে পড়ল।

মিঃ আহমদের চোখ-মুখেও ভাবের উদয় হলো, তিনি কন্যার অন্তরের কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু মিঃ হারুনের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললেন—দস্যু বনহুরের এটাও মস্ত অভিনয়। নইলে এতগুলো যুবতীকে নারীহরণকারীদের হাতে রেখে শুধু আপনাকে সে উদ্ধার করত না, আপনি যদি পুলিশ সুপারের কন্যা না হতেন। পুলিশ সুপারের মেয়েকে উদ্ধার করে— তার পিতার নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে দস্যু নিজেকে সাধু বানাতে চেয়েছিল।

না আপনি এসব তার সম্বন্ধে অন্যায় উক্তি করছেন। সত্যি তিনি মহৎ মহান— দস্যু হলেও তিনি একজন হৃদয়বান লোক। আপনি বলেছেন, তিনি শুধু আমাকেই উদ্ধার করেছেন, তা নয় পুলিশ যা পারেনি রাজ্য পরিচালকগণ যা করতে সক্ষম হয়নি, সেই অসাধ্য সাধন করেছেন দস্যু বনহুর। তিনি নারীহরণকারীদের শুধু সায়েস্তাই করেননি, সমূলে তাদের ধ্বংস করেছ।

মিঃ আহমদ অস্ফুট কণ্ঠে ধ্বনি করে উঠলেন— কি বলিস মা।

হাঁ আব্বা, নারীহরণকারীদেরকে এক এক করে তিনি হত্যা করেছেন। তারপর যত যুবতী তাদের বন্দীখানায় ছিল, সবাইকে তিনি বোনের মত সম্মান দিয়ে যার যার আবাসে পৌছে দিয়েছেন। আর যাদের তিনি পৌঁছে দিতে পারেননি, তাদের থানা অফিসারদের হেফাযতে দিয়েছেন যেন ওরা স্বদেশে নিজ নিজ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়। বলুন আপনারা, তিনি এসব করে অন্যায় করেছেন?

মিঃ হারুন কোন কথা বললেন না।

মিঃ আহমদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কন্যার মুখের দিকে।

❑

ভীম সেন নূরীকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছে। সকল অনুচরকে বলে দিয়েছে—এই তাদের রাণী। যা বলবে সে, তাই যেন ওরা করে বা শোনে। ভীম সেন নিজেও নূরীর কথা মানতো, যেখানেই দস্যুতা করতে যাক নূরীর পরামর্শ নিত, ভীম সেন নূরীর মধ্যে এমন একটা আলোর সন্ধান পেয়েছে যা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। দস্যু দুহিতা নূরী নিজের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে ভীম সেনের দলের মধ্যে, নূরীর বুদ্ধি এবং কৌশলে সবাই তাকে রাণী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল না।

ভীম সেন যখনই জাহাজে দূরদেশে দস্যুতা করতে যেত তখনই নূরী তাদের সঙ্গে যেত, মনিও যেত তাদের সঙ্গে।

মনি এখন হাঁটতে শিখেছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলতে শিখেছে। নূরীকে মনি মা বলে ডাকে।

দিন যায়।

নূরী এখন ভীম সেনের দলের একচ্ছত্র রাণী। ডাকু ভীম সেন এবং রঘু নূরীর কথায় উঠে-বসে, এমনকি নূরী যেদিন দস্যুতা করতে যাবার জন্য আগ্রহ দেখায় তখনই ভীম সেন দলবল নিয়ে যাত্রা করে।

ভীম সেনের দলকে নূরী নিজের বশীভূত করার পেছনে ছিল একটা গোপন অভিসন্ধি। যেদিন নূরী বজরা ত্যাগ করে চলে আংেস, সেদিন যে শপথ গ্রহণ করেছিল, বনহুর তার ভালবাসার প্রতিদানে চরম আঘাত দিয়েছে—এর প্রতিশোধ সে নেবে। তার হৃদয়ে যে বিষের আগুন সে জ্বেলে দিয়েছে, সে আগুন দিয়ে বনহুরকে নূরী দগ্ধীভূত করবে। বনহুরকে চরম আঘাত দিতে পারলে তবেই হবে তার শান্তি। চৌধুরীকন্যা মনিরার সকল সাধ সে ধূলায় মিশিয়ে দেবে। বনহুরকে নূরী শিশুকাল থেকে ভালবেসে এসেছে, প্রাণের চেয়েও অধিক সে ভালবাসা, মায়া মমতা। সেই গভীর প্রেমকে বনহুর পদদলিত করে অন্য একটি মেয়েকে স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সব আঘাত নূরী সইতে পারে। মাথায় যদি বজ্রাঘাত হত তাতেও নূরী বিচলিত হত না যাত আঘাত পেয়েছে সে, বনহুর যখন বলেছে, মনিরাকে সে বিয়ে করেছে। না না, এ কথা নূরী ভাবতেও পারে না। হুর—সে যে তার একার! ওকে ছাড়া নূরী বাঁচতে পারে না। সে বিষের জ্বালা নূরীর মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। যতক্ষণ এর প্রতিশোধ সে না নিতে পেরেছে ততক্ষণ তার মনের সে আগুন নিভবে না।

আজ সেই দিন সামনে উপস্থিত।

নূরী চেয়েছিল নিজে একটা দস্যুদল গঠন করবে। তারপর বনহুরকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় দেখিয়ে দেবে। দেখিয়ে দেবে তার প্রেমকে উপেক্ষা করার কি পরিণতি। তার সে ইচ্ছা অতি সহজেই পূরণ হলো—ভাগ্যই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে ডাকু ভীম সেনের গুহায়।

নূরী মনের অভিসন্ধি মনে চেপে দিনের পর দিন নিজের দলকে অতি নিপুণভাবে তৈরি করে নিল যাতে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে তার এতটুকু বেগ পেতে না হয়।

কিন্তু দিনরাত নূরী মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে চলল, শেষ পর্যন্ত বনহুরের নিকট তার দলের যদি পরাজয় হয়। বনহুরকে যদি পাকড়াও করতে না

পারে তাহলে? কিন্তু তবু যে কোন উপায়ে হোক ওকে সমুচিত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত তার হৃদয়ের জ্বালা নিভবে না। প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ--

একদিন ভীম সেনকে বলল নূরী— বাপু, তোমার কাছে আমি কোনদিন কিছু চাইনি, একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে।

ভীম সেন হেসে বলল— বল, কি কথা তোমার রাখতে হবে মা! আমার জীবন দিয়েও তা রাখতে চেষ্টা করব।

বাপু, আমি জানি, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ডাকু তুমি।

হাঁ মা, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ভীম সেনের মত বিখ্যাত ডাকাত আর ত্রিভুবনে নেই। কেন মা?

বাপু, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি মস্ত দস্যু। কেউ নাকি তাকে কোনদিন বন্দী করতে পারে না, আমি চাই তাকে বন্দী করতে।

হাঃ হাঃ হাঃ এই কথা। দস্যু বনহুর সে আবার একজন মস্ত দস্যু—কি যে বল মা। কিন্তু হঠাৎ এ সখ কেন হলো মা?

বাপু, আমার বড় রাগ হয় যখন শুনি দস্যু বনহুর নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দস্যু। তাই ওকে বন্দী করে কিছুটা সাজা দেয়া আমার ইচ্ছা।

বেশ বেশ, তোমার ইচ্ছা আমি কি পূরণ না করে পারি?

ভীম সেন সেই দিনই তার অনুচরগণকে ডেকে বলল— তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি আজ রাতেই দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে যাব।

নূরী চমকে উঠল, কথাটা সে নিজে বলেছে সত্য, কিন্তু অপরের মুখে এ কথাটা যেন তার কানে গরম সীসা ঢেলে দিল। অনেক চিন্তা করার পর নিজেকে কঠিন করে নিল নূরী। না, সে কিছুতেই নিজেকে বিচলিত করবে না। মনকে সে পাষাণ করবে। বনহুর তার সব আশা-আকাঙ্খা-বাসনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। কিছুতেই সে ওকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু ভীম সেনের দল কি পারবে তাকে বন্দী করে আনতে? কারও সাধ্য নেই বনহুরকে বন্দী করে। শুধু নূরী—নূরী পারে তাকে বন্দী করতে। তাকে নাকানি চুবানি খাওয়াতে।

নূরী গোপনে ভীম সেনের কানে কিছু গোপন কথা বলে নিল। যা বলল, তাতে দস্যু বনহুরকে বন্দী করা মোটেই কঠিন হবে না।

কয়েকখানা বড় নৌকা নিয়ে ভীম সেনের দল নদীপথে রওয়ানা দিল। নূরী এবং মনিও চলল তাদের সঙ্গে। পথে যাতে নূরী ও তার শিশুর কোন কষ্ট না হয় সেজন্য ভীম সেনের লক্ষ্য কম ছিল না। দিনের বেলায় নৌকাগুলো নদীর কোন জঙ্গলময় স্থানে লুকিয়ে রাখা হত, আর গোটা রাত ধরে চলত তাদের পথচলা। কয়েকদিন অবিরত চলার পর কান্দাই

বনের অদূরে শম্ভু নদীর একটা গোপন স্থানে তারা নৌকা রাখল। জায়গাটা জঙ্গলে ঘেরা একটা বাঁক। সহসা কারও নজরে পড়বে না নৌকা। নূরী বহুদিন বনহুরের সঙ্গে শম্ভু নদীতীরে ঘোড়ার চড়ে বেড়াতে এসেছে। কাজেই এসব পথ তার অতি পরিচিত।

নূরী ভীম সেনের অনুচরদের নিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়ল। একে অন্ধকার রাত তদুপরি ভীম সেনের জংলী অনুচরগণের জমকালো চেহারা। কাল রাতের অন্ধকারে ওদের কাল দেহ মিশে যেন এক হয়ে গেল।

সবাই অস্ত্র নিয়ে নূরীকে অনুসরণ করল।

নূরী নৌকা থেকে নেমে পুনরায় একবার সবাইকে বলল— তোমাদের কাছে আমার বারবার অনুরোধ, দস্যু বনহুরকে তোমরা জীবন্ত পাকড়াও করবে, ভুল করেও যেন তার শরীরে আঘাত কর না।

রঘু বলল— যদি সে আক্রমণ করে?

নূরী কিছু বলার পূর্বেই বলল ভীম সেন—তোমরা শুধু নিজেদের রক্ষা করবে।

নূরী, ভীম সেন ও রঘু চলল আগে, আর তাদের দলবল চলল পেছনে।

অন্ধকার রাতে চলা ডাকাত বা দস্যুদের কষ্টকর কিছু নয়। এসব তারা অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত। কাজেই ভীম সেনের দল নূরী ও সর্দারের পদশব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

যে পথে নূরী অগ্রসর হলো সে পথ অতি গোপনীয়। এ পথের সন্ধান আর কেউ জানে না—একমাত্র বনহুর আর নূরী ছাড়া। আর জানে রহমান।

নূরী বনহুরের আস্তানার নিকটবর্তী হয়েই ভীম সেন ও তার দলবলকে বলল— আমি গোপনে আস্তানার মধ্যে প্রবেশ করছি, যতক্ষণ ফিরে না আসব ততক্ষণ তোমরা এই বনের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অতি সাবধানে লুকিয়ে থাকবে—দেখ কোনরকম যেন শব্দ না, হয় আমি এসে বাঁশীতে ফুঁ দেব। সেই বাঁশী টেনে আনবে বনহুরকে।

ভীম সেন বলল বাঁশী। বাঁশী তুমি কোথায় পাবে মা?

সে অনেক কথা—বলব পরে।

ইতোমধ্যে নূরী যখন ভীম সেনের দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল তখনও একবার ভীম সেন প্রশ্ন করেছিল—এসব পথ তুমি কি করে চিনলে মা?

নূরী বলেছিল, বাপু, একদিন সব তোমাকে খুলে বলব আজ তুমি কিছুই জানতে চেওনা।

ভীম সেন বাঁশী সম্বন্ধে প্রশ্ন করে একটু লজ্জা পেল।

নূরী চলে গেছে ততক্ষণে।

ভীম সেন দলবল নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। এসব ব্যাপার তার কাছে এমন কোন নতুন নয়। ভীম সেন নূরীকে নিয়ে সতর্ক রইলো কখন নূরী ফিরে আসে।

নূরী আসার সময় মনিকে নৌকায় ঘুমপাড়িয়ে রেখে এসেছে। দু'জন অনুচরকে তার পাহারায় রেখে এসেছে সে। কাজেই নূরী মনির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। নূরী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আস্তানায় প্রবেশ করল। যে পথে নূরী আস্তানায় প্রবেশ করল এ পথ অত্যন্ত গোপন পথ। কাজেই এদিকে বনহুরের কোন অনুচর পাহারায় থাকত না। নূরী অতি সতর্কতার সঙ্গে কৌশলে এগিয়ে চলল। অনেক দিন আগে ছেড়ে যাওয়া তার নিজের কক্ষের দিকে।

নূরী নিজ কক্ষের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। ঐ স্থান থেকে বনহুরের কক্ষ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কক্ষে আলো জ্বলছে তখন। নিশ্চয়ই আজ বনহুর আস্তানা ছেড়ে বাইরে যায়নি। এটাই নূরী চেয়েছিল. মনে মনে খুশি হলো সে।

অতি কৌশলে নিজের কক্ষে প্রবেশ করল নূরী। কক্ষ শূন্য। কক্ষে কোন আলো না থাকায় কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজও নূরীর মানসপটে কক্ষের প্রতিটি স্থান ও তার নিজ হাতে রাখা জিনিসপত্রের অস্তিত্ব অনুভব করল। নূরী হাতড়িয়ে এগুলো। পূর্বধারে তার বিছানা পাতা ছিল। হাঁ, ঠিক সে ভাবেই রয়েছে। একপাশে আলনায় তার জামা কাপড়গুলো সাজান ছিল—হাঁ, সেগুলোও ঠিক তেমনি আছে। কোন জিনিস নড়চড় হয়নি। নূরী এবার দেয়াল হাতড়িয়ে তাক খুঁজে দেখতে লাগল। হাঁ পেয়েছে ছোট্ট একটা লম্বা বাক্স। নূরী অন্ধকারেই বাক্সটা চেপে ধরল বুকে। এ বাক্সে রয়েছে তার অতি প্রিয় বাঁশী, যে বাঁশীর সুর শুধু কান্দাই বনের গাছের শাখায় শাখায় দোলা জাগায়নি, বনের প্রতিটি পশুপক্ষী সে সুরে তন্ময় হয়ে গেছে। তন্ময় হয়েছে বনহুরের অনুচরগণ। স্তব্ধ হয়ে গেছে কান্দাই বনের আলো-বাতাস।

নূরী যখন ঝর্ণার পাশে বসে বাঁশী বাজাত তখন দস্যু বনহুর যেখানেই থাক বাঁশীর সুর কানে পৌঁছামাত্র আত্মহারা হয়ে ছুটে আসত তার পাশে। এমন কোন শক্তিই ছিল না যে শক্তি বনহুরকে বাধা দেয়।

আজ নূরী সেই যাদুকাঠি তুলে নিল হাতের মুঠায়। তার দু'চোখে আজ প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা। অতি সন্তপর্ণে নূরী নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

এত সহজে সে আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ভাবতে পারেনি। নূরী, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিন্তু একটা আশঙ্কা বারবার জাগতে লাগল তার হৃদয়ে। বুকটা টিপ টিপ করছে।

নূরী এসে দাঁড়াতেই ভীম্ সেন আর রঘু বেরিয়ে এলো। ভীম সেন বলল— কি হলো মা? খবর ভাল?

হাঁ। গলাটা কাঁপলো নূরীর।

রঘু বলল, দস্যু বেটা আজ তাহলে বাইরে যায়নি?

নূরী কম্পিত ঠোঁটে বাঁশীখানা চেপে ধরল। বহুদিন পর আজ আবার সেই সুর। নূরীর ঠোটে বাঁশীর সুর কেঁপে কেঁপে উঠল। বনের শাখায় শাখায় পাখিগুলো পাখা ঝাপটা দিয়ে উঠল, স্তব্ধ বাতাসে জাগল স্পন্দন। দোলা লাগল পাতায় পাতায়।

নূরী চাপাকণ্ঠে বলল— দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই আসবে, অতি সাবধানে তাকে ধরে ফেল তোমরা। দেখো যেন আঘাত করোনা। আবার নূরী বাঁশীতে ঠোঁট রাখল। অপূর্ব সুরের মুর্ছনায় অন্ধকার বনভূতি মুখর হয়ে উঠল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট-- কই সে তো আসছে না। নূরীর বাঁশীর সুরে আরও জোরে ঝঙ্কার উঠল।

ঐ তো শুকনো পাতায় মানুষের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। নূরীর বাঁশীর সুর লক্ষ্য করে কে যেন এগিয়ে আসছে।

ভীম সেন রঘুকে ইংগিত করল।

পদশব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওইতো সামনে এগিয়ে আসছে, কে। রঘু শিস্ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভীম সেনের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তে থেমে গেল নূরীর বাঁশীর সুর।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির শব্দ। পরমুহূর্তে ভীম সেনের কঠিন গম্ভীর কণ্ঠস্বর --- খবরদার, নড়ো না।

নূরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল—একজনকে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে ধরেছে। নিশ্চয়ই বনহুর ছাড়া অন্য কেউ নয়। কেমন জব্দ করেছে নূরী তাকে।

ভীম সেন দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য শিকল সঙ্গে এনেছিল, ওকে মজবুত করে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর সবাই মিলে নিয়ে চলল তাকে।

❑

হঠাৎ এ অবস্থার জন্য বনহুর একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। গভীর রাতে যখন সে বিছানায় শুয়ে নানা কথা চিন্তা করছিল—মা, মনিরা নূরী--পর পর সকলের কথা ভেসে উঠছিল তার মনের পর্দায়। কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার চোখে, এমন সময় তার কানে ভেসে আসে সেই সুর-- যে সুর তার অতি পরিচিত। বহুদিন বনহুর এই সুরের আকর্ষণে ছুটে গেছে বন হতে বনান্তরে। নূরী কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে বাঁশী বাজাত। বনহুর তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেত। নূরী লুকিয়ে থেকে হাসত খিল খিল করে। আজ সেই বাঁশির সুর বনহুরকে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত করে ফেলে। বনহুর জানে নূরী হারিয়ে গেছে। রাগ বা অভিমান করে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। তবে কি নূরী ফিরে এসেছে? সেই পরিচিত সুরে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে? বনহুর কিছু চিন্তা না করে নিরস্ত্রভাবে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল? ভুলে গিয়েছিল সেখানে কোন বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে।

বুদ্ধিমান দস্যু বনহুর নূরীর চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরীর বাঁশীর সুর—বনহুর ভুলে গিয়েছিল নিজের অস্তিত্ব— প্রবল একটা আকর্ষণে ছুটে এসেছিল সে এখানে--- নইলে তাকে বন্দী করা এত সহজ ছিল না। শুধু নূরীর বাঁশীর সুরই তাকে এই পরাজয়ের মালা পরিয়ে দিল।

দস্যু বনহুরকে বন্দী করে— এ সাধ্য ছিল না ভীম সেন বা তার দলের। যতবড় ডাকাত বা দস্যু হোক, কিছুতেই ওকে বন্দী করতে সক্ষম হত না,

যদি নূরী কৌশল অবলম্বন না করত। নূরীর বুদ্ধি ও চতুরতায় বন্দী হলো দস্যু বনহুর।

বনহুরকে শিকলে বেঁধে নৌকায় তুলে নেয়া হলো। বনহুর জানল, না কে তাকে এভাবে বন্দী করল। আর কোথায়ই বা তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কয়েক দিন অবিরত চলার পর ভীম সেনের আস্তানায় পৌঁছল তারা।

বনহুরকে পূর্বের ন্যায় শিকলাবদ্ধ অবস্থায় এখানে আনা হলো পাহাড়ের একটি গুহায় আবদ্ধ করে রাখা হলো। ক্রুদ্ধ সিংহ বন্দী হলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি হলো দস্যু বনহুরের।

ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে রয়েছে সে।

কিছু মাংস আর রুটি তাকে নৌকায় খেতে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বনহুর তা খায়নি শুধু পানি খেয়েছিল মাঝে মাঝে।

অন্য নৌকায় থাকলেও নূরী এ খবর পেয়েছিল। যতই কঠিন হতে যাক সে, তবু পারছিল না। মনের মধ্যে ব্যথার কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। যার এতটুকু কষ্ট তার কোন দিন সহ্য হয় না, যার মলিন ব্যথাভরা মুখ দেখলে নূরীর হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠে, যার জন্য নূরী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই হুর আজ ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে রয়েছে। নূরীর অন্তরটা গুমড়ে কেঁদে মরলেও কিছু বলতে বা করতে পারছিল না। কারণ বন্দীর প্রতি অনুরাগ দেখান শোভা পায় না তার। তাছাড়া ভীম সেন এতে সন্তুষ্ট হবে না। নূরী এখন তীব্র জ্বালায় মরছে। না পারছে বনহুরের কষ্ট সহ্য করতে, না পারছে তার প্রতি কোন দরদ দেখাতে। নূরী নিজে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগল। কাউকে মনের কথাও বলবে না বা বলার সাহসও নেই নূরীর। বনহুরকে বন্দী করে আনতে ভীম সেনের দলকে যা দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা বলার নয়। এত করার পর বন্দী সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখান তার পক্ষে সমীচীন হবে না। ভীম সেন ডাকাত— কঠিন প্রাণ মানুষ। হয়ত হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়ত ভুল বুঝতে পারে। মনের কোণে দারুণ ব্যথা নীরবে সহ্য করে চলল নূরী।

একটা অন্ধকার গুহায় বনহুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। গুহার এককোণে একটা মশাল দপ দপ করে জ্বলছে। গুহার দরজায় দু'জন ভীষণ চেহারার দস্যু সুতীক্ষ্ণ বর্শা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গুহার সামনে অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ভীম সেনের আস্তানা আজ ঝিমিয়ে পড়েছে। গত ক'দিনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম আর জাগরণের পর সবাই বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু নূরীর চোখে ঘুম নেই।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সে। পাশে ঘুমন্ত মনি। নূরী শয্যা ত্যাগ করল, নিজের খাবার সে অতি যত্নে ঢেকে রেখেছে। তার হুর আজ ক'দিন উপবাস রয়েছে আর সে খাবে কোন মুখে। খাবারের থালা হাতে দরজার পাশে এসে উঁকি দিল, কোন রকমে যদি একবার ওর মুখে একটু খাবার তুলে দিতে পারত। কিন্তু উপায় নেই। নূরী ভেবেছিল, বনহুরকে কঠিন শাস্তি দিলে তার মনে শান্তি আসবে। কই, তা তো হলো না। বরং ওকে বন্দী করে নূরীর হৃদয়ের জ্বালা আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। নূরী খাবারের থালা হাতে ফিরে এলো কুঠরির মধ্যে। পাথরের খণ্ডটার উপরে খাবারের থালা রেখে বসে পড়ল হতাশায় ভরে উঠল তার মন।

রাত ভোর হলো, গাছে গাছে পাখি পাখা ঝাপটে জেগে উঠল বিছানায় জেগে উঠল মনি। নূরী তখনও খাবার থালার সামনে বসে অশ্রু বিসর্জন করছে।

মনি বিছানার পাশে নূরীকে না দেখে আধো ভাঙ্গা কণ্ঠে ডাকল মাম্মা। মাম্মা। কই।

নূরী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, ফিরে তাকিয়ে দেখল মনি বিছানায় বসে দু'হাত প্রসারিত করে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। সুন্দর ছোট্ট ফুটফুটে মুখে এ কিসের আকুলতা। ওর ঐ মুখখানা কেন নূরীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার হুরের কথা। সেই নাক, সেই মুখ, সেই গভীর নীল দুটি চোখ। নূরী এগুতে গিয়ে এগুতে পারে না। সুন্দর ছোট ললাটে কুঞ্চিত একগোছা চুল ঠিক তার হুরের মত। নূরী ছুটে এসে বুকে তুলে নেয়, আদর করে ডাকে মনি, আমার মনি, বাপ আমার ---

মনি নূরীর গলা জড়িয়ে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে— মাম্মা! মাম্মা! তুমি ঘুমোওনি?

সুন্দর ভাঙা ভাঙা অস্ফুট ধ্বনি নূরীর কানে মধু বর্ষণ করে।

নূরী বলে— না বাপ, আমি ঘুমাইনি।

কেন আম্মা?

নূরী তার কোন জবাব দিতে পারল না।

মনির ফুটফুটে নধর শরীরে তখন কোন জামা ছিল না। নূরী মনির দক্ষিণ হাতখানা নিয়ে বারবার দেখতে লাগল। মনির দক্ষিণ বাজুতে একটা জট রয়েছে। নূরী মাঝে মাঝে এই জট অবাক হয়ে দেখত, সুন্দর ফর্সা হাতে একটি কায়লা সঙ্কেতচিহ্ন।

নূরী মনিকে নিয়ে বনহুরের কষ্টের কথা ভুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু যখন শুনল, বনহুরকে পাথরে বেঁধে চাবুকের আঘাত করা হবে, তখন নূরী কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। একে আজ ক'দিন অনাহারে কাতর সে, তারপর এই নির্মম শাস্তি না না, কিছুতেই এ হতে পারে না। ভীম সেনকে বলে সে এই আদেশ রদ করবে।

নূরী ছুটে গেল ভীম সেনের গুহায়, কিন্তু তার পূর্বেই বনহুরকে পাথরখণ্ডের সঙ্গে দু'হাত বেঁধে চাবুক দিয়ে মারা হচ্ছে। অন্ধকার গুহায় মশালের আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। গুহায় পাথরের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল নূরী। একজন জমকালো লোক চাবুক নিয়ে বনহুরের দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। ভীম সেন সামনে দণ্ডায়মান। সকল অনুচর অস্ত্র হাতে দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রঘু ডাকু ভীম সেনের পাশে একটা ছোরা হাতে দণ্ডায়মান।

আঘাতের পর আঘাত পড়ছে বনহুরের শরীরে। দেহের জামা ছিঁড়ে একপাশে ঝুলে নেমেছে। দেহের কতক অংশ বেরিয়ে পড়েছে। কয়েক জায়গা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। একি নির্মম দৃশ্য। কেন সে এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে গেল কেন সে এমন ভুল করল।

বনহুরের শরীরে আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নূরী নিজের শরীরে সেই আঘাত যেন অনুভব করতে লাগল। বিকৃত হলো তার মুখমণ্ডল।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে ছুটে গেল। নিজের গুহায়। মনিকে বুকে তুলে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেদে উঠল। চোখের সামনে ভাসতে লাগল বনহুরের প্রতি সেই নির্মম যন্ত্রণার করুণ দৃশ্য। নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল।

বহু চেষ্টা করেও নূরী বনহুরকে উদ্ধার করার উপায় খুঁজে পেল না।

নূরীকে কাঁদতে দেখে মনির মনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কিছুতে ভেবে পাচ্ছে না তার মা এমন করে কাঁদছে কেন?

মনি অস্ফুট কণ্ঠে বলল— আম্মা, তুমি অমন করে কাঁদছ কেন?

নূরী কি বলবে, কি জবাব দেবে শিশু মনির প্রশ্নের? কি করে বলবে যাকে ধরে আনা হয়েছে সে অপর জন নয়, সে তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। কেমন করে এ কথাটা কচি মনিকে বুঝিয়ে বলবে।

নূরী নীরবে কাঁদে।

আজও গোটা দিন নূরী কিছু মুখে দিল না। সেই মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক দৃশ্যটা বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। দেয়ালের সাথে হাত দুটো শিকলে বাঁধা—বনহুরের শরীরে চাবুকের আঘাত করা হচ্ছে তার সুন্দর দেহ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মুখোভাবে ফুটে উঠেছে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন। অথচ নীরব সে। একটি শব্দও সে করছে না। যতই সে দৃশ্যের কথা ভাবে নূরী, ততই তার মনে বেদনার কাঁটা শেল হয়ে বিদ্ধ হয়। নূরী কি জানত বনহুরের কষ্ট ব্যথা তারই হৃদয়ে এসে আঘাত করবে।

আজও বনহুর জানে না, কেন এভাবে বন্দী করে আনা হয়েছে। কেন তার ওপর এই নির্মম কশাঘাত করা হচ্ছে। কার অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে এর পেছনে, কিছুই জানে না সে।

বনহুর জানে নূরী বেঁচে নেই।

আর বেঁচে থাকলেও সে কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে?

❑

গভীর রাত।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে একটা মাটির ছোট্ট পাতিল তুলে নিল হাতে, তারপর বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। অদূরে আর একটা গুহার মুখে দু'জন ভীম চেহারার দস্যু সুতীক্ষ্ণ ধারাল বর্শা হাতে পাহাড়া দিচ্ছে। সামনে অগ্নিকুণ্ড দাউদাউ করে জ্বলছে।

নূরী মাটির ছোট্ট পাতিল হাতে চারদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুলো। নিস্তব্ধ বনভূমির জমাট অন্ধকার অগ্নিকুণ্ডের আলোতে যদিও কিঞ্চিত আলোকময় হয়ে উঠলো, তবুও বেশ অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। নূরী অতি সতর্কতার সঙ্গে ভীম চেহারার পাহারদার দু'জনের পাশে এসে দাঁড়াল।

নূরীকে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল পাহারাদারদের চোখেমুখে। বলল একজন—রাণীমা, তুমি!

নূরী ফিস্ ফিস্ করে বলল— তোমাদের জন্য একটু তাল রস রেখেছিলাম, এনেছি খাবে?

পাহারাদার দু'জনের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো।

তালরস পেলে এরা সব ভুলে যায়। তাছাড়া রাণীমা যখন নিজ হাতে নিয়ে এসেছে—কম কথা নয়।

পাহারাদার দু'জন নূরীর হাত থেকে মাটির পাতিলটা নিয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে কিছুটা খেয়ে দ্বিতীয় জনের হাতে দেয়। সেও খুশিতে আত্মহারা, অল্পক্ষণেই ছোট পাতিলটা শূন্য হয়ে গেল।

ঢুলু ঢুলু করছে পাহারাদার দস্যু দু'জনের চোখ। এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল অগ্নিকুণ্ডের পাশে।

নূরী দ্রুত হাতে পাহারাদার দু'জনের কোমর হাতরে গুহার দরজা খোলার চাবি বের করে নিল। তারপর ফিরে গেল নিজের গুহায়, দ্রুত হাতে কিছুটা খাবার নিয়ে পুনরায় ফিরে এলো, তারপর দরজা খুলে প্রবেশ করল বনহুরের অন্ধকার গুহার মধ্যে।

গুহার এক পাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে নূরী তাকিয়ে দেখলো অদূরে একটা প্রশস্ত পাথরের উপরে উবু হয়ে শুয়ে আছে বনহুর।

নূরী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল। বনহুর ঘুমাচ্ছে। গোটা দিন তার উপরে যে নির্মম যন্ত্রণা চলেছে সে অতি জঘন্য। নূরীর গণ্ড বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে এগুলো নূরী বনহুরের দিকে। পাশে গিয়ে খাবারের থালাটা রাখল—তারপর বসে পড়ল ওর পাশে। মশালের আলোতে দেখল, বনহুরের পিঠের চামড়া কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ব্যথিত দৃষ্টিতে নূরী দেখতে লাগল। বনহুরের জামাটা ছিড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। পিঠ ও দক্ষিণ হাতখানা সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে। নূরীর দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল বনহুরের দক্ষিণ বাজুতে। একটা কাল জট তার সুন্দর হাতের বাজুতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নূরী চমকে উঠল এ চিহ্ন যে তার মনির বাজুতেও রয়েছে। কিন্তু ভেবে পায় না নূরী, বনহুরের সঙ্গে তার

মনির এত মিল রয়েছে কেন? যাক ক্ষতগুলোর দিকে। ব্যথায় দিয়ে উঠল নূরীর হৃদয়। মোচড় নিজের ওসব ভাবনার সময় এখন তার নেই। নূরী আবার তাকাল বনহুরের পিঠে অজ্ঞাতে হাতখানা ওর পিঠে এসে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল নূরী।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের ঘুম ভেঙে গেল, কার কোমল হাতের স্পর্শ তার পিঠে এসে পড়েছে। বনহুর চট করে উঠে বসল কিন্তু নূরী ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা টেনে সরে বসে।

বনহুর উঠে বসে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল—কে তুমি?

নূরী এভাবে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল যে তাকে চিনার কোন উপায় ছিল না। নূরীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। কোন কথা বলল না।

বনহুরের অভ্যাস নয় কোন নারীর দেহ স্পর্শ করা। সে ইচ্ছা করলেই নূরীর ঘোমটা সরিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু সে তা করল না।

নূরী নীরবে খাবার থালাটা এগিয়ে দিল বনহুরের সামনে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তাকাল ঘোমটা ঢাকা মুখখানার দিকে—কে এই নারী? তার প্রতি এত দরদই বা কেন? আর এই গহন বনে অজানা দস্যু-গুহায় সাধারণ মেয়ে মানুষ এলোই বা কি করে?

ক্ষুধার্ত বনহুর অবহেলা করতে পারল না। থালাখানা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

বনহুরের খাওয়া শেষ হলে নূরী থালাটা হাতে তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এরপর থেকে প্রতিদিন নূরী বনহুরের গুহায় আসত। নিজের খাবার থেকে কিছু বাঁচিয়ে বনহুরকে খাইয়ে রেখে যেত। কিন্তু সাবধান থাকত সে, কোন সময় ঘোমটা সরাত না বা কোন কথা বলত না।

অজানা নারী মনে করে বনহুরও কোন কথা বলত না—প্রশ্ন করত না কিছু।

বনহুর একা এই গুহায় প্রহর গুণত, কখন আসবে সেই নারী মূর্তি, যার নীরব মায়ায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়েছে। অজানা অচেনা এই নারী সম্বন্ধে বনহুরের অনেক চিন্তা। নারীটি কে? কি এর পরিচয়? এই বদ্ধগুহায় প্রবেশই বা করে সে কেমন করে? আর রোজ তাকে এমনি খাবার খাইয়ে যায়? বনহুর ভাবে, একদিন ওর ঘোমটা খুলে ফেলবে—দেখবে কে সে। কেনই বা আমার নিকট অমন করে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

পরদিন গভীর রাতে নূরী এলো অতি সন্তর্পণে ঘোমটা মুখ ঢেকে, হাতে খাবারের থালা।

বনহুর মিছামিছি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলো পাশ ফিরে। আজ সে কথা না বললে কিছুতেই জাগবে না বা খাবে না।

নূরী অতি লঘু পদক্ষেপে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়াল। বনহুরকে ঘুমন্ত মনে করে খাবারের থালাটা মেঝেতে শব্দ করে রাখল।

কই, তবু তো ঘুম ভাঙল না ওর।

নূরী পুনঃ পুনঃ থালার শব্দ করল।

ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়, জাগ্রত মানুষকে জাগানো যায় না। নূরী বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ল ভয় হঠাৎ যদি কেউ এদিকে এসে পড়ে তাহলে উপায় কি হবে?

নূরী বনহুরের পাশে বসে গায়ে হাত রাখল, একটু নাড়া দিল কই, তবুও ঘুম ভাঙছে না? বনহুরের দুষ্টামি বুঝতে পারল নূরী। নিশ্চয় তাকে কথা বলাতে চায়।

নূরী খাবার রেখে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল।

অমনি বনহুর উঠে নূরীর পথ রোধ করে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়াল নূরী, ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল বনহুর তার মুখের দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। এবার বলল বনহুর— আজ তোমার মুখের আবারণ খুলে ফেলতে হবে। কে তুমি?

নূরীর বুকটা ধক করে উঠলো। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো সে।

বনহুর এগিয়ে এলো— তুমি যদি তোমার মুখের ঘোমটা না সরাও তবে আমি জোর করে খুলে ফেলব।

নূরী তবু নীরব।

বনহুরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে একটানে ঘোমটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল বনহুর— নূরী!

নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে বনহুরের বুকে মুখ লুকাল।

বনহুর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। যে নূরীর সন্ধানে সে বনে বনে ঘুরে ফিরছে, যে নূরীর চিন্তায় বনহুরের রাতের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছে— সেই নূরী তার সামনে— জীবিত সে।

বনহুর গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নিল বুকে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল— নূরী, তুমি এখানে কি করে এলে?

নূরী সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—হুর, তুমি আমাকে হত্যা কর! হত্যা কর হুর। আমিই তোমার এ অবস্থার জন্য দায়ী।

নূরী!

হাঁ হুর, আমিই সেদিন কান্দাই বনে বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে ঘর থেকে বনে নিয়ে এসেছিলাম। ভীম সেন ডাকাতের দ্বারা তোমাকে বন্দী করিয়েছি।

নূরী!

হুর, তোমাকে নির্মম শাস্তি দিতে আমিই ডাকাতদলকে বাধ্য করেছি।

বেশ, এতেই যদি তোমার শান্তি হয়, আমি তোমার সে দান মাথা পেতে নেব।

হুর! নূরী আবার লুটিয়ে পড়ল বনহুরের বুকে, আমাকে তুমি মাফ কর হুর, আমাকে তুমি মাফ কর।

বনহুর পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নূরী কেঁদে কেঁদে এক সময় শান্ত হল। বলল নূরী—হুর, চলে যাও তুমি, এই মুহূর্তে চলে যাও হুর।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর— আর তুমি?

আমি আর ফিরে যাব না।

নূরী, জানি না কেন তুমি আমার প্রতি এত অবিচার কর? কেন তুমি সেদিন বজরা থেকে অমন চুপ করে পালিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে ব্যথা দিয়ে তুমি কি শান্তি পাও নূরী?

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছে হুর। তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি আনন্দ পাই।

নূরী!

হুর, তুমি চলে যাও। চলে যাও!

না, তোমাকে না নিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।

কিন্তু--

কিন্তু কি?

ভীম সেন ডাকু আমাকে নিজ কন্যার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে আমি ধোঁকা দিতে পারি না।

আর আমাকে তো তুমি ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলে নূরী? কেন আমি কি তোমায় একটুও ভালবাসি না।

হুর।

বল নূরী?

এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও।

আর তুমি?

আমি মনিকে নিয়ে এখানেই কাটিয়ে দেব।

মনি! তোমার মনি বেঁচে আছে নূরী?

হাঁ, সে এখন অনেক বড় হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে।

নূরী আমি তোমাকে একা ফেলে যাব না।

তুমি আমার জন্য ভেবো না হুর, আমি এখানেই ভাল থাকব।

আবার যদি আমাকে বন্দী করে নিয়ে আস?

তোমাকে বন্দী করে রেখেছি আমার মনের সিংহাসনে। তোমার বাহ্যিক দেহটার কোন প্রয়োজন নেই আমার।

নূরী! গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নেয় বনহুর।

না না, তুমি যাও, তুমি যাও।

আমি যাব না।

সেকি!

হাঁ, তোমাকে রেখে আমি যেতে পারব না। যেতে পারব না নূরী--

নূরী নিজেকে হারিয়ে ফেলে বনহুরের মধ্যে।

❑

বনহুর ভীম সেনের হাত ধরে শপথ করে— আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

খুশি হয় ভীম সেন।

দস্যু বনহুরকে বশীভূত করা কম কথা নয়। ভীম সেন বনহুরের শিকল নিজ হাতে খুলে দেয়।

বনহুর আর ভীম সেন বুকে বুক মিলিয়ে একতাবদ্ধ হয়।

রঘু কিন্তু এ মিলনে খুশি হতে পারল না কেমন একটা হিংসা তার মনে জট পাকাতে লাগল। ভীম সেনের প্রিয় এবং বলিষ্ঠ জন ছিল রঘু। বয়স রঘুর খুব বেশি নয়, বনহুরের চেয়ে দু'এক বছরের বেশি হবে।

বনহুর এমন বেশে স্বচ্ছভাবে ভীম সেনের দলের সঙ্গে মিশে গেছে। ভীম সেন তাকে নিজের দলের একটা শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিয়েছে। রঘুর এটাও একটি ঈর্ষার কারণ হলো।

বনহুর দেখল শক্তি এদের কম নেই। কিন্তু বুদ্ধির অভাব যথেষ্ট।

একদিন বনহুর ভীম সেনের দলের সঙ্গে জলপথে যাত্রা করল।

উদ্দেশ্য—কোন বজরা বা নৌকা লুট করা।

বনহুর কিন্তু ভীম সেনকে বলল—তার চেয়ে চল কোন ধনীর বাড়ি হানা দিয়ে মোটা সোনাদানা নিয়ে আসি। নৌকা বা বজরার যাত্রীদের কাছে কতই বা পাওয়া যাবে!

বনহুরের কথামত এক গ্রামে ধনবান এক মহাজনের বাড়িতে হানা দিয়ে তারা বহু অর্থ আর অলঙ্কার নিয়ে ফিরে এলো। ভীম সেন জীবনে এত অর্থ ও অলংকার এক সঙ্গে কোনদিন লুট করে আনতে সক্ষম হয়নি। আজ ভীম সেনের আনন্দ আর ধরে না।

আস্তানায় একটা উৎসবের আয়োজন করল ভীম সেন।

অনেক ছোরা, তরবারি, লাঠি খেলা দেখাল। পুরুষরা নাচও দেখাল অনেকে।

এখানে যখন ভীম সেনের দল আনন্দে মাতোয়ারা। তখন বনহুর ধীরে ধীরে সরে পড়ল সেখান থেকে। নূরীর সন্ধানে চারদিকে তাকাল।

নূরী আজ উৎসবের স্থানে নেই। ঘন বনের মধ্যে একটা পাহাড়িয়া নদী, নাম তার মন্দিনা—নূরী মন্দিনার তীরে একটা পা ঝুলিয়ে বসেছিল। জ্যোস্নাভরা আকাশ, রাত কিন্তু বেশ হয়েছে। মনি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

সেদিনের পর থেকে নূরী আর বনহুরের সামনে যায়নি। রাগ না অভিমান, না অন্য কিছু—এ সে নিজেই জানে না। যতদূর সম্ভব নূরী বনহুরকে এড়িয়ে চলে। কোন সময় বনহুরকে সে দেখা দেয় না।

নূরীর এই পালিয়ে বেড়ান বনহুরের কাছে অসহ্য লাগে। এত লোকের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে বড় একা বোধ করে। কিসের জন্য—যদি না নূরীর ইংগিত থাকত এর পেছনে।

নূরীর পাশে এসে বনহুর দাঁড়াল।

নূরী তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছিল। বনহুরের পদশব্দে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে বলে— তুমি!

বনহুর ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়ল— আর এখানে তুমিও বা কেন?

হুর, আমি চাই না তুমি ভীম সেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে দস্যুতা কর।

এতে তোমার অমত কেন নূরী? বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে দক্ষিণ হাতে— আজ ক'দিন তোমাকে দেখিনি।

আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই।

সে কারণেই তুমি সরে এসেছিলে বুঝি?

হঁ্যা।

কিন্তু আমি যদি তোমাকে---

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়— চুপ কর।

নূরী নিজেকে কিছুতেই বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিতে পারল না।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

বনহুরের বাহুবন্ধনে নূরী। মৃদুমন্দ বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে নূরীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছতে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে নূরীর চোখে মুখে। বনহুর নূরীর ললাট থেকে কেশগুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে বলে উঠে— চল নূরী, আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু--

কিন্তু কি নূরী?

তোমার মনিরাকে ছাড়তে পারবে?

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল বনহুর— মনিরা-- ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে গেল বনহুর। উদাসভাবে তাকাল দূরে— অনেক দূরে, মন্দিনা নদীর অপর পারে।

নূরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন হয়ে ছিল। বুকের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে আঘাত করল।

কখন যে নূরী বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে এসেছে খেয়াল নেই। ঘুমন্ত মনিকে বুকে চেপে চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত করে ফেলেছে। সব ব্যথা ছাপিয়ে মনে পড়ছে নূরীর একটা কথা— বনহুরকে সে কোনদিন ফিরে পাবে না।

মনিরা তার মন চুরি করে নিয়েছে।

❑

নকিব একখানা কাগজের টুকরা এনে মনিরার হাতে দিল— আপা মনি একজন বুড়ো মানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বুড়ো মানুষ? মনিরা ভাঁজকরা কাগজখানা খুলতে খুলতে বলে।

তারপর কাগজখানায় দৃষ্টি ফেলতেই চমকে উঠে ,লেখা রয়েছে শুধু মাত্র দু'লাইন—বৌ রাণী, কথা আছে।"

মরিয়ম বেগম পাশে বসে একটা বই পড়ছিলেন। চশমার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন— কে মা? কি লিখেছে?

মনিরা উঠে কাপড় ঠিক করতে করতে বলল—আগে নয় এসে বলব। দ্রুত চলে গেল মনিরা নিচে।

হলঘরে উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ।

মনিরা প্রথমে চমকে উঠল— পরে নিজের মনে খেয়াল করে নিল রহমানের চেহারাটা।

মনিরাকে দেখে এগিয়ে এলো রহমান— বৌরাণী।

রহমান খবর কি? ও কেমন আছে?

নতমুখে জবাব দিল— সেই খবর নিয়েই এসেছি।

উৎকন্ঠাভরা গলায় বলল মনিরা— শিগ্‌গির বল কি খবর রহমান?

রহমানের চোখ অশ্রু ছলছল করছে— ধরা গলায় বলল—

সর্দার আজ ক'দিন হলো নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

নিরুদ্দেশ হয়েছে! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে মনিরা। তারপর পুনরায় বলে ওঠে— কোথায়? কবে? কি করে?

আমরা কিছুই জানি না বৌরাণী। একদিন ভোরে আমরা সর্দারের কক্ষে প্রবেশ করে দেখি তিনি নেই—বিছানা শূন্য।

তোমাদের না বলে কোথায় গেল?

তিনি যেখানেই যান আমাকে না বলে কোথাও যান না। তা ছাড়া সর্দার নিরস্ত্রভাবে কোথাও যাবেন না, এটা আমরা জানি।

তার মানে?

সর্দার তাঁর কোন অস্ত্রই সঙ্গে নিয়ে যাননি। এমনকি তার রিভলবার খানাও টেবিলে যেমন রেখেছেন, তেমনি আছে।

এ তুমি কি বলছ রহমান!

হাঁ, বৌরাণী, আমরা সবাই বড়ই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সর্দার কোনদিন আমাদের না জানিয়ে কোথাও যান না। আর গেলেও নিরস্ত্রভাবে যান না--

তবে কি হলো রহমান?

কেমন করে বলব বৌরাণী। আজ ক'দিন তার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে তবে এসেছি আপনাকে কথাটা জানাতে।

এ তুমি কি সংবাদ আনলে রহমান! একটু থেমে বলল মনিরা—আর তোমরা সবাই চুপ করে বসে আছো?

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলল—না, আমরা চুপ করে বসে নেই বৌরাণী, আমাদের বিভিন্ন দল দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি নিজেও বহু জায়গায় সন্ধান নিয়েছি, এমনকি পুলিশ অফিসেও খোঁজ নিয়ে জেনেছি সর্দার কোথাও বন্দী হয়েছেন কিনা। আজ তাহলে চলি। আবার ঝিন্দে যাব। যদি সেখানে কোন কারণে গিয়ে থাকেন।

আচ্ছা যাও। হতাশভরা কণ্ঠে রহমানকে বিদায় জানাল মনিরা।

রহমান চলে গেল।

মনিরা ফিরে এলো বিষণ্ন মলিন মুখে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে বিষণ্ন মুখে ফিরে আসতে দেখে চিন্তিত হলেন, বললেন—কে এসেছিল মা মনিরা?

মনিরা মামীমার পাশে এসে বসল, বলল— রহমান।

রহমান! সে আবার কে?

তোমার ছেলের সহকারী।

মনিরের সহকারী? কি সংবাদ ওর? আমার মনির তো ভাল আছে?

সেই সংবাদই তো নিয়ে এসেছে সে।

কি সংবাদ বল্ মা, দেরী করিসনে।

তোমার ছেলে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাকে ক'দিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম---আমার মনিরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

না।

এ তুই কি বলছিস মনিরা?

হাঁ মামীমা, আজ ক'দিন নাকি তার কোন সন্ধান নেই।

মরিয়ম বেগম ললাটে করাঘাত করলেন --হায়, একি হলো। আমি এই রকম একটা ভয়ই করছিলাম। কি হবে মা এবার?

মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। সত্যিই তার যদি কিছু হয় বা হয়ে থাকে, তাহলে মনিরা বাঁচবে কাকে নিয়ে। কার পথের দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণবে।

মনিরা ছুটে গেল নিজের ঘরে। তার আর শিশু বনহুরের ফটোখানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফটোখানা খুলে নিয়ে চেপে ধরল বুকের মধ্যে, আপন মনেই বলে উঠল— তুমি কোথায়? ওগো তুমি কোথায়? আমার জীবনের একমাত্র প্রদীপ তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।

কেঁদে কেঁদে মনিরার দু'চোখ রাঙা হয়ে উঠল।

চৌধুরী বাড়িতে নেমে এলো এক দুর্যোগময় ঘটনা। বাড়ির সরকার আর নকিব ছাড়া কেউ জানল না এ বাড়িতে কি ঘটেছে, যার জন্য, মরিয়ম বেগম এবং মনিরার অশ্রু শুকাচ্ছে না।

কেঁদে কেটে আকুল হলেন মরিয়ম বেগম, কিন্তু কোন উপায় নেই যাতে তার সন্তানের খোঁজ পাবেন।

সরকার সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না মরিয়ম বেগম।

মনিরার মনের অবস্থাও তাই।

চৌধুরী বাড়িতে যখন বনহুরকে নিয়ে চিন্তার অবধি নেই, তখন বনহুর ভীম সেনের দলে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে বসেছে।

ভীম সেন সব সময় বনহুরকে নিজের পাশে রেখে কাজ করে। তারই পরামর্শে চলে।

রঘুর হিংসা দিন দিন বেড়ে চলল। যাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো সে এখন সর্দারের সহকারী। গোপনে সে নিজের দল গঠনে লেগে পড়ল এবং সুযোগ খুঁজতে লাগল কেমন করে বনহুরকে হত্যা করবে।

বনহুর সরল স্বাভাবিক মন নিয়ে মেতে রয়েছে নিজের কাজে। ভীম সেন যাতে খুশি থাকে সেই কাজ করে সে। আবার সুযোগ পেলেই ছুটে যায় নূরীর পাশে।

মন্দিনা নদীতীরে নূরী আর বনহুর হাসে, গান গায়—বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। মনিও থাকে তাদের সঙ্গে।

এ দৃশ্য একদিন রঘুর চোখে পড়ে যায়।

বনহুর আর নূরী সেদিন একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে গল্প করছিল। হাসছিল ওরা দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে।

রঘু দূর থেকে লক্ষ্য করল।

চুপ করে গিয়ে জানাল ভীম সেনের কাছে।

ভীম সেন তখন অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখছিল, রঘু গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে—সর্দার।

ভীম সেন তাকাল তার মুখের দিকে।

রঘুর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, কঠিন কণ্ঠে বলল—সর্দার, বনহুর রাণীর সঙ্গে প্রেম করছে।

গর্জে উঠল ভীম সেন—প্রেম!

ভীম সেনের আদেশ ছিল, তার আস্তানায় কোন নারী থাকবে না বা কোন অনুচর নারীর সংশ্রবে যাবে না। নূরীকে ভীম সেন কন্যার আসনে স্থান দিয়েছিল এবং তার প্রতি সেই রকম আচরণ সে নিজে করত আর অনুচরগণকেও করার জন্য আদেশ দিয়েছিল। বনহুরের সঙ্গে নূরীর যে কোন সম্বন্ধ বা পরিচয় থাকতে পারে, একথা ভীম সেন কোন সময় ভেবে দেখেনি বা ভাবার মত তার মনোভাব হয়নি।

হঠাৎ রঘুর মুখে 'প্রেম' শব্দটা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ভীম সেন, বলল—বনহুর রাণীর সঙ্গে প্রেম করছে?

হাঁ, সর্দার। আমার সঙ্গে এসো, দেখবে চল।

ভীম সেন আর রঘু খোলা তরবারি হাতে দ্রুত এগিয়ে চলল। একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন। একটু পূর্বে যেখান থেকে রঘু দেখে গিয়েছিল বনহুর আর নূরীকে।

ভীম সেনের মুখ কঠিন হয়ে উঠল, দেখলো বনহুর শিশু মনিকে নিয়ে আদর করছে। নূরীর চিহ্ন নেই সেখানে। ভীম সেন রঘুকে অবিশ্বাসী বলে গাল দিল।

রঘু সর্দারের মুখে এই শব্দ প্রথম শুনল। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করল রঘু। তারপর চলে গেল্ল সেখান থেকে। এমন অপদস্থ জীবনে সে কোনদিন হয়নি। এ তার চরম অপমান।

রঘুর মনে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে নূরীর প্রতি রঘুর লালসা ছিল। শুধু ভীম সেনের ভয়ে সে কোনদিন নূরীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি।

নূরী নিজের গুহায় বসে জামা সেলাই করছিল। মনির এবং নিজের জামাকাপড় নূরী নিজেই সেলাই করত। আজ একটা জামা সেলাই করছিল আর গুন গুন করে গান গাইছিল। নূরীর মনে আজ কোন দুঃখ নেই। তার হুরকে সে জয় করে নিয়েছে, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ওকে সে পেয়েছে।

নূরী বনহুরের চিন্তায় মগ্ন, ঠোঁটে গানের মৃদু দোলা। চোখের সামনে ভাসছে অতীতের কত দৃশ্য।

হঠাৎ পেছন থেকে রঘু নূরীর মুখ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে গুঁজে দিল একটা রুমাল। অতি সহজে তুলে নিল কাঁধে। গুহার অদূরে অন্ধকারে কয়েকজন রঘুর অনুচর অপেক্ষা করছিল। নূরীকে নিয়ে রঘু পৌঁছতেই তারা ওকে ধরে মন্দিনা নদীবক্ষে ছোট্ট একটা ডিঙ্গি নৌকাতে তুলে নিল।

রঘু ফিরে এলো আস্তানায়।

নূরীকে যখন মুখে রুমাল গুঁজে মন্দিনা নদীবক্ষে ডিঙ্গি নৌকায় উঠিয়ে নেয়া হলো তখন বনহুর নিজের গুহায় পাথরের শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছে।

পরদিন ভীম সেনের দলের মধ্যে একটা মহা আলোড়ন শুরু হলো—নূরী নিরুদ্দেশ হয়েছে।

বনহুরের কানেও কথাটা গেল। শুনে সে চিন্তিত হলো, এই গহন বনে সে যাবে কোথায়?

মনি মায়ের জন্য আকুলভাবে কাঁদছে।

বনহুর মনিকে তুলে নিল বুকে। কিন্তু নূরী গেল কোথায়? বনহুর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এখানে সে কার জন্য রয়েছে? শুধু নূরী—নূরীর জন্য সে আজও এই ভীম সেনের আড্ডায় পড়ে রয়েছে।

বনহুর শিশু মনিকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছে না।

ভীম সেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নিজের অনুচরগণকে নূরীর সন্ধানে ছড়িয়ে দিল সে বনের বিভিন্ন স্থানে।

ভীম সেন নিজেও বের হলো ঘোড়ায় চেপে।

রঘু হাসল মনে মনে।

বনহুর রঘুর মুখোভাব লক্ষ্য করে দাঁতে দাঁত পিষলো।

নূরীকে যখন ডিঙ্গিনৌকায় তুলে নেওয়া হলো তখন নূরী চিৎকার করতে না পারলেও সে নিজের হাতের আংটি এবং মাথার কাঁটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নদীতীরে।

কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক তাকে মজবুত করে হাত-পা বেঁধে ডিঙ্গির উপর ফেলে রাখল।

গোটা রাত ধরে ডিঙ্গি চলল। ভোর হবার পূর্বেই একটা দ্বীপের মত জায়গায় এসে তারা ডিঙ্গি নৌকাখানা বেঁধে ফেলল। নূরীকে এবার বন্ধনমুক্ত করে দিল।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল নূরী। এতক্ষণ মুখে রুমাল বাঁধা থাকায় নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

নূরীকে জোরপূর্বক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল বলিষ্ঠ লোকগুলো।

নূরী শত চেষ্টা করেও ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারলো না।

চারদিকে পানি আর মধ্যে এই অদ্ভুত ধরনের দ্বীপ। বড় বড় পাথর আর টিলার মত উঁচুনীচু অসমতল জায়গা। মাঝে মাঝে বড় বড় জংগল আর গাছপালা।

নূরীকে এই দ্বীপের এক স্থানে এনে নামিয়ে নেওয়া হলো। কতগুলো পাথর এক জায়গায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকগুলো নূরীকে নিয়ে সেই পাথরের স্তূপের কাছে এসে থামল। কয়েকজনে ধরে একটা পাথর সরিয়ে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা সুড়ঙ্গপথ।

লোকগুলো সেই সুড়ঙ্গপথে নূরীকে নিয়ে চলল।

নূরীকে যখন লোকগুলো সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছিল তখন নূরী নিজের আংগুল কমড়ে কিছুটা কেটে ফেলল। রক্ত বেরিয়ে এলো নূরীর আংগুল বেয়ে। নূরী সেই রক্ত পাথরের গায়ে একটা সংকেত চিহ্নের আকারে মুছে নিল।

নূরীকে নিয়ে লোকগুলো সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হল। কোথায় চলেছে, পথের যেন শেষ নেই। অন্ধকার পথ, একটা লোক মশাল হাতে আগে আগে চলেছে।

সমতল সুড়ঙ্গপথ।

মাঝে মাঝে বাঁক ঘুরে চলে গেছে অন্যদিকে। নূরী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পথের যেন শেষ নেই। নূরী নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করল।

মৃত্যু ছাড়া এখান থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই তার।

হুর --- মনি তার মনি না জানি কত কাঁদছে। কচি মনির মুখখানা নূরীর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

এবার প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো।

নূরী মশালের আলোতে দেখলো, গভীর মাটির নিচে একটি প্রশস্ত কক্ষ। চারদিকে পাথরের দেয়াল, মাঝে মাঝে গাছের গুড়ির থাম দিয়ে ছাদটা আটকে রাখা হয়েছে। কেমন ভিজে স্যাঁতসেঁতে মেঝে। একপাশে গাছের গুড়ির তৈরি একটি খাটিয়া, কয়েকটা মোটা ধরনের লতাগুল্মের তৈরি বসার আসন। আরও দেখল নূরী, একপাশে মেঝেতে পড়ে রয়েছে দুটো মাটির কলসী। কয়েকটা বড় বড় বোতল।

শিউরে উঠল নূরী, এগুলো কিসের বোতল তা সে জানে। এত গভীর মাটির নিচে মদের বোতল এলো কি করে! নিশ্চয়ই এটা শয়তানদের গোপন আস্তানা।

নূরীর অনুমান মিথ্যা নয়।

শয়তান রঘু গোপনে এই আস্তানা তৈরি করে নিয়েছে। এখানেই তার গোপন বৈঠক চলে। আর চলে মদের আড্ডা। রঘু দুর্দান্ত এবং চালাক ডাকু। ভীম সেন সর্দার হলেও তাকে রঘু ভেতরে ভেতরে কমই পরোয়া করত। মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে লোকালয়ে গিয়ে বিলেতী মদ নিয়ে আসত। স্বভাবও তার মোটেই সৎ ছিল না। নূরী এখানে আসার পর থেকে তার মনে কুচিন্তা দানা বেঁধেছে। কিন্তু ভীম সেনের আস্তানায় থেকে তার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে না। কাজেই সেই থেকে রঘু নূরীকে সরাবার জন্য কৌশলে জাল বিস্তার করছিল। অজানা-অচেনা এক দ্বীপে সে সুড়ঙ্গ কেটে একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছিল, যেখানে সে নূরীকে নিয়ে চিরদিনের জন্য সরে যেতে পারে। ভীম সেন কেন, ভীম্ সেনের বাবা এলেও আর তার ও নূরীর সন্ধান পাবে না।

কিন্তু সময়ের প্রয়োজন।

তাই রঘু ধীরে ধীরে তার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এমন দিনে হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বনহুর এসে পড়ল তাদের দলে। কেঁচো তুলতে সাপ বেরিয়ে পড়ল। নূরীকে সরাতে তার কোন বেগ পেতে হত না, কিংবা কয়েকদিন পরে সরালেও চলত, কিন্তু তা হবার উপায় নেই। তাই রঘু নূরীকে দ্রুত সরিয়ে ফেলল ভীম সেনের আস্তানা থেকে। একমাত্র বনহুরের জন্য তাকে এত তাড়াতাড়ি করতে হলো।

একদিন নয়, আরও কয়েকদিন রঘু বনহুর আর নূরীকে একসঙ্গে মিশতে দেখেছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষেছে। কিন্তু নীরব রয়েছিল সে, বললে সব কাজ হয়ত ফাঁস হয়ে যাবে।

তবু একদিন বলেছিল রঘু ভীম সেনের কাছে। তাতেও হিতে বিপরীত হয়েছে। ভীম সেন তাকে অবিশ্বাসী বদনাম দিয়েছে। নূরীকে সরিয়ে বনহুরকে শেষ করবে, এই তার মনের বাসনা।

নূরীকে তার অনুচর দ্বারা সরিয়ে ফেললেও রঘু ভীম সেনের পাশে পাশে রইল। তাকে যেন কোনরকম সন্দেহ না করে।

ভীম সেন বনে বনে নূরীর সন্ধান করতে লাগল। বনহুর আর রঘু তার সঙ্গে রয়েছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন।

আর রঘুর মুখোভাব দুষ্টামিতে ভরা, গোপনে বারবার সে বনহুরের মুখ লক্ষ্য করে নিচ্ছিল আর মনে মনে খুশি হচ্ছিল।

ভীম সেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে সত্যিই নূরীকে মেয়ের মত ভালবেসে ফেলেছিল। নূরীর অদর্শনে ভীম সেনের হৃদয়ে শান্তি ছিল না।

মন্দিনা নদীতীরে এসে দাঁড়াল ভীম সেন, রঘু আর দস্যু বনহুর। ভীম সেন নদীর দিকে তাকিয়ে দু'হাত জুড়ে বলল—মা গঙ্গে, তুই হামার ম্যাইয়্যারে এনে দে। মা গঙ্গে---

ভীম সেন চোখ মুদে নদীর নিকটে প্রার্থনা জানাতে লাগল, তার মুদিত চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এত দুঃখেও বনহুরের হাসি পেল। নদী কি করে তার মেয়েকে এনে দেবে, ভেবে পেল না বনহুর।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেল নদীর ধারে একটা স্থানে। কি যেন পড়ে রয়েছে সেখানে। বনহুর এগিয়ে এলো, নত হয়ে যেমনি জিনিসটা হাতে উঠিয়ে নিতে যাবে, অমনি রঘু পায়ের চাপে মাটিতে দেবে দিল।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াল, কঠিন মুখোভাব নিয়ে তাকাল রঘুর দিকে।

রঘু কোন জবাব না দিয়ে মাটি থেকে জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর পানিতে। তারপর বলল—বাপু চলো!

ভীম সেন হাতের পিঠে চোখ মুছে দাঁড়াল।

ভীম সেনের সঙ্গে রঘু পা বাড়াল। বনহুর ফিরে তাকাল পূর্বের সেই স্থানটিতে। যেখানে ইতোপূর্বে কোন একটা জিনিস সে দেখেছিল যা রঘু নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছিল। জিনিসটা কি ছিল, কেনই বা রঘু তাকে দেখতে না দিয়ে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করল? বনহুর তাকাতেই অদূরে ঠিক তার কাছ থেকে হাত দুই দূরে কি যেন চকচক করে উঠলো। বনহুর এবার ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে চকচকে জিনিসটা হাতের তালুতে উঠিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল বনহুর, এ যে নূরীর আংটি! বনহুরই একদিন নূরীকে এটা উপহার দিয়েছিল। বনহুর তাকিয়ে দেখল ভীম সেন আর রঘু অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

বনহুর আংটিটা হাতে নিয়ে এবার ভাবতে লাগল, তারপর তাকাল অদূরে এগিয়ে চলা রঘুর দিকে। নিশ্চয়ই রঘুর চক্রান্তেন নূরী নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং তাকে এই নদীপথেই সরানো হয়েছে। নূরী চিহ্নস্বরূপ তার আংটি রেখে গেছে নদীতীরে। বনহুর লক্ষ্য করল যেখানে আংটিটা পেয়েছে সেখানে এবং তার আশেপাশে ভিজে মাটিতে বেশ কিছু সংখ্যক পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারল, নূরীকে নৌকাপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বনহুরও এগুলো ভীম সেন ও রঘুর পেছনে পেছনে।

নূরী বন্দিনী অবস্থায় ভূগর্ভে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলল।

রঘুর অনুচরগণ তাকে সেখানে রেখে কিছু খাবার ও এক কলসী পানি ছাড়া আর কিছুই দিয়ে যায়নি।

নূরী এই নির্জন পাতাল গহ্বরে একা কি করবে। এখান থেকে আর তার উদ্ধার নেই। বাঁচার কোন আশাও নেই। মৃত্যুর জন্য নূরী ভীত নয়। ভয় এই নির্জন পাতালপুরীতে কেউ যদি তার ওপর হামলা করে বসে। ভয় তার ইজ্জতের, ভয় তার সতীত্বের।

যা ভেবেছিল তাই হলো।

একদিন অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো রঘু ডাকুর। সে কি ভীষণ চেহারা, মদ পান করে মাতাল হয়ে এসেছে সে। হাতে তার মদের বোতল।

নূরী রঘুকে দেখেই ভয়ে বিবর্ণ হলো।

তাকে যে রঘুই হরণ করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে, এ কথা সে জানে। কারণ, তাকে যখন নৌকায় তুলে নেওয়া হচ্ছিল তখন রঘুই তাকে কাঁধে করে এনেছিল।

নূরী ভীত হলেও ঘাবড়াল না, বলল—রঘু, তুমিই আমাকে একদিন বাঁচিয়েছ, আর আজ তুমিই....

অট্টহাসিতে ফেটে ছিল রঘু, তারপর হাসি থামিয়ে বলল—বাঁচিয়েছিলাম বলেই আজ আমি তোমাকে চাই।

রঘু, তুমি না বাপুর কাছে শপথ করেছ, কোন নারীকে তুমি স্পর্শ করবে না?

হাঃ হাঃ হাঃ, শপথ---- রেখে দাও তোমার শপথ। আমি ওসব মানি না। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, ঐ দিন তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করবো বলে শপথ করেছি। আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য চাই---আর তারই জন্য আমার এত প্রচেষ্টা। জান এই পাতাল গহ্বরে আমি কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করে এই গোপন স্থানটি তৈরি করে নিয়েছি। এখানে কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। সর্দার ভীম সেনও না।

নূরী অসহায়ভাবে বলে উঠল—কিন্তু পাপ তোমার চাপা থাকবে না।

পাপ হাঃ হাঃ হাঃ, পাপ! রঘু ডাকু পাপকে ভয় করে না সুন্দরী। ডাকু লোক পাপকে ডরায় না। পাপ ডরায় ডাকুকে দেখে, বুঝেছ? এসো সুন্দরী! রঘু এগোয় নূরীর দিকে।

নূরী ভীতভাবে পিছু হটতে থাকে।

বনহুর একটা ছোট ছিপ নৌকা বেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মন্দিনা নদীর বুকে বনহুরের বৈঠার ঝুপঝাপ শব্দ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

বনহুরের শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দ্রুত হাত চালাচ্ছে সে।

বনহুর রঘুকে অনুসরণ করেই নৌকা ভাসিয়েছিল। ও যাতে টের না পায় সেজন্য বেশ দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। তার লক্ষ্য ছিল রঘুর নৌকায়।

রঘুর নৌকা যখন দ্বীপে এসে ভীড়লো তখন বনহুরের ছিপনৌকা রঘুর নৌকা থেকে প্রায় দু'শ হাতের বেশি দূরে। রঘু নৌকা রেখে দ্বীপে অদৃশ্য হবার পর বনহুর এসে পৌঁছল রঘুর নৌকার পাশে।

প্রখর সূর্যের তাপে বনহুরের মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠেছে। সুন্দর ললাটে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ছাপ। তবু কোন হতাশ নেই, প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ছুটে এসেছে সে নূরীর সন্ধানে।

নূরী নিরুদ্দেশ হবার পর বনহুর রঘুর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। কারণ, প্রথমেই তার সন্দেহ হয়েছিল রঘুকে। যদিও নূরী অদৃশ্য হবার পর রঘু ভীম সেনের আস্তানা ছেড়ে একবারও বাইরে যায়নি, তবুও বনহুরের মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রঘুই নূরীকে সরিয়েছে। সেদিনের পর থেকে তাই বনহুরের চোখে নিদ্রার অবসান হয়েছে। সর্বদা বনহুর রঘুকে পাহারা দিত। রাতে বিছানায় শুয়ে গোপনে তাকিয়ে থাকত রঘুর দিকে। দিনে রঘু যেখানেই যেতো বনহুরও থাকত ওর পাশে। সুচতুর রঘু অনেক করেও বনহুরের দৃষ্টির বাইরে যেতে-পারেনি। বনহুর রঘুর চেয়ে কম চতুর নয়।

বনহুর সেদিনই বুঝতে পেরেছিল, যেদিন সে নদীতীরে নূরীর আংটি কুড়িয়ে পেয়েছিল—বুঝতে পেরেছিল কোন পথে নূরীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেদিন হতেই বনহুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল— নদীপথে শয়তানকে অনুসরণ করতে তার যেন কোন ভুল না হয়। অসুবিধা না হয়। অতি গোপনে একটা ছিপনৌকা সংগ্রহ করে নিতে সক্ষম হয়েছিল সে।

আজ বনহুর সেই ছিপনৌকা নিয়েই রঘুকে গোপনে অনুসরণ করছিল।

বনহুর দ্রুতহস্তে ছিপনৌকাখানা টেনে খানিকটা উপরে তুলে নিল। তারপর ছুটতে শুরু করল বালির উপর রঘুর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছুদূর এগুতেই বালুভূমি শেষ হয়ে উঁচুনীচু অসমতল জঙ্গলাকীর্ণ পথ শুরু হলো। বনহুর কোন দিকে এগুবে ভাবতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার তার সময় নেই। আবার এগুতে শুরু করল।

বনহুর যখন বনভূমি ডিংগিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, ওদিকে তখন রঘুর কবলে নূরী হিংস্র বাঘের থাবায় যেমন মেষশাবকের অবস্থা হয় তেমনি নিজেকে রক্ষার জন্য কক্ষময় ছুটাছুটি করছিল।

প্রসারিত থাবা মেলে রঘু নূরীকে ধরার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আর নূরী নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় পিছু হটছে।

নূরী কয়েকবার মদের খালি বোতল ছুড়ে মেরেছে।

রঘু অতি কৌশলে নিজের মাথা বাঁচিয়ে নিয়েছে।

ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত রঘু নূরীকে ধরার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠেছে।

বনহুর তখন বনময় ছুটাছুটি করছে, কোথায় রঘু অদৃশ্য হলো। না জানি নূরীকে সে কোথায় বন্দী করে রেখেছে, তার উপর কি অত্যাচার করছে তাই বা কে জানে। বনহুর পাগলের ন্যায় অন্বেষণ করে চলেছে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে—অদূরে কয়েকটা পাথর পাশাপাশি পড়ে রয়েছে। একটা পাথরের উপর নজর পড়তেই বনহুর চমকে উঠল, পাথরটার গায়ে রক্তের একটা ক্রস চিহ্ন।

ইতোপূর্বে রঘু এখানেই, এই পথেই এসেছে এবং সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে, কিন্তু ঐ রক্তের চিহ্ন তার নজরে পড়েনি। কারণ সে তখন স্বাভাবিক মনোভাব নিয়ে ছিল না। কিছুটা মদ সে এখানে দাঁড়িয়েই পান করে নিয়েছিল। একটা ছিপিও বনহুর কুড়িয়ে পেল।

এবার বনহুরের কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে এলো। অতি সহজেই পাথরখন্ড সরিয়ে ফেলল বনহুর। বিস্মিয়ে স্তম্ভিত হলো—সামনে একটা সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেল সে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করল।

ওদিকে রঘু নূরীকে ধরে ফেলেছে।

নূরী নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে! কিল, চড়, লাথি দিয়ে ও রঘুর হাত থেকে উদ্ধার পাচ্ছে না সে। নূরী কামড়ে রঘুর হাত রক্তাক্ত করে দিয়েছে, তবু রঘু তাকে প্রবলভাবে এঁটে ধরেছে। চোখে মুখে রঘুর উন্মত্ত নেশা।

নূরী মরিয়া হয়ে ধস্তাধস্তি করছে। মনে প্রাণে খোদাকে সে স্মরণ করছে, হে দয়াময়! তুমি আমাকে বাঁচাও! আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

আর বুঝি নিজেকে রক্ষা করতে পারে না নূরী।

এই বুঝি তার জীবনের চরম পরিণতি। নূরী হাত-পা ছোড়ে, দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, তবু নিজেকে রঘুর কবল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

রঘু আর নূরীতে ভীষণ ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর এসে দাঁড়াল সুড়ঙ্গমুখে। কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠল—নূরীকে ছেড়ে দাও রঘু।

রঘু সামনে যম দেখলেও বুঝি এত চমকে উঠত না।

সঙ্গে সঙ্গে রঘু নূরীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ক্ষুব্ধ শার্দুলের কবল থেকে হরিণ শিশু ছাড়া পেয়ে যেমন ছুটে যায় মায়ের পাশে, তেমনি নূরী রঘুর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনহুরের বুকে।

বনহুর নূরীকে গভীরভাবে বুকে টেনে নিল, পরক্ষণেই নূরীকে সরিয়ে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল রঘুকে।

রঘু ভাবতেই পারেনি এই পাতালপুরীতে কেউ তার সন্ধান পাবে।

রঘু আর বনহুরে চলল লড়াই।

অসীম শক্তিশালী ওরা দু'জনই।

রঘু নিরস্ত্র বলে বনহুর নিজের ছোরা ব্যবহার করল না। নইলে এক নিমেষে ওকে শেষ করে ফেলত।

রঘু অল্পক্ষণেই টের পেল, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী দস্যু বনহুর।

এবার রঘু পালাবার জন্য পথ খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ বনহুরকে ধাক্কা দিয়ে সুড়ঙ্গপথের বিপরীত দিকে অগ্রসর হলো রঘু।

ওদিকে দেয়াল।

রঘু কোথায় যেন চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে একটা পথ বেরিয়ে এলো। রঘু সেই পথে ছুটতে শুরু করল। বনহুরও তার পেছনে ছুটে চলল।

আবার ধরে ফেলল বনহুর রঘুকে।

রঘু পড়ে গেল মেঝেতে।

চলল আবার ধস্তাধস্তি।

নূরী কিছুতেই একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সেও বনহুরের পিছু পিছু ছুটে এলো।

এদিকে যে এমন একটা পথ আছে একটুও বুঝার উপায় ছিল না।

বনহুর আর রঘুর লড়াই চলেছে।

রঘু নিজেকে বাঁচাবার জন্য বহু চেষ্টা করছে। হঠাৎ বনহুরকে ধরাশায়ী করে রঘু ছুটে পালাল। মাত্র এক মুহূর্তে, বনহুর উঠে রঘুর পেছনে ধাওয়া করল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, আর অল্প দূরে গিয়েই রঘু লাফিয়ে পড়ল একটা গর্তের মধ্যে।

বনহুর আর নূরী ছুটে গিয়ে দেখল, গর্তটা খুব গভীর এবং নিচে পানির ভীষণ ছলছল কলকল শব্দ হচ্ছে।

বনহুরও লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু নূরী ওকে জাপটে ধরে ফেলল–না না, হুর, তুমি ও কাজ করনা। ক্ষান্ত হও।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়েছে। জামাটা ভিজে চুপসে গেছে। নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল—হুর!

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল কাছে। অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল—নূরী!

নিজের আঁচলে নূরী বনহুরের ললাটের এবং মুখের ঘাম মুছে দিতে লাগল।

❑

ভীম সেনের সামনে দাঁড়িয়ে রঘু।

ভীম সেনের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠল ভীম সেন–তোমার কথা সত্য?

হাঁ সর্দার, সব সত্য। আপনার কন্যা সমতুল্য নূরীকে ঐ শয়তান বনহুর গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি আজ তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। আর নূরীকে উদ্ধার করতে গিয়ে এই দেখুন আমার অবস্থা....নিজের শরীরের ক্ষতগুলো দেখায় রঘু।

ভীম সেনের দেহের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল।

সে তখনই তার অনুচরগণকে আদেশ দিল—নিয়ে এসো ধরে যেখানে পাবে বনহুরকে। আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারব।

ভীম সেন যখন তার হুকুম পেশ করছিল তখন নূরীকে নিয়ে হাজির হলো বনহুর।

রঘুকে ভীম সেনের সামনে দণ্ডায়মান এবং ভীম সেনকে ক্রুদ্ধ দেখে বনহুর সমস্ত ব্যাপারখানা বুঝে নিল।

কিন্তু তার পূর্বেই রঘুর ইংগিতে বনহুরের বুকে তীর-ধনু বাগিয়ে ধরা হলো।

ভীম সেনের অন্যান্য অনুচর বনহুরকে বন্দী করে ফেলল।

অবশ্য বনহুর নিজে একা হলে তাকে বন্দী করার সাধ্য তাদের তখন ছিল না, সবাইকে পরাজিত করে পালাতে সক্ষম হতো সে , কিন্তু নূরী আর মনিকে রেখে পালাবে কি করে!

নূরী আর মনির জন্যই বনহুর আজ ভীম সেনের দলের হাতে নিজেকে সমর্পন করল।

নূরী অনেক করে বুঝিয়ে বলল, বনহুর তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। সব দোষ রঘুর। রঘুই তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল–সব বলল। কিন্তু ভীম সেন সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করল না।

রঘুর চক্রান্তভরা কথাই ভীম সেন মেনে নিল।

ভীম সেন নারীহরণের অপরাধে বনহুরকে কঠিন শাস্তি–অগ্নিদগ্ধ করবে মনস্থ করে ফেলল।

বনহুরকে আবার সেই অন্ধকারময় গুহায় শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

ভীম সেন আদেশ দিল শুকনো কাঠ আর ডালপালা সংগ্রহ করতে, বনহুরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে।

ভীম সেনের আদেশ লংঘন হবার উপায় নেই।

বনের মধ্যে একটা জায়গায় শুকনো কাঠ আর শুকনো ডালপালার স্তূপাকার হয়ে উঠাল একটা উঁচু জায়গায় বনহুরকে হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবায় আয়োজন করা হলো।

নূরী মনিকে বুকে চেপে কাঁদতে লাগল। এবার আর ওকে বাঁচান সম্ভব হবে না। নিজের দোষে আজ নূরী বনহুরের হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল। নানাভাবে চিন্তা করতে লাগল, কোন উপায় ওকে বাঁচাতে পারে কিনা, কিন্তু কোন কৌশলেও সম্ভব হবে না।

এক সময়ে ভীম সেনের নিকটে গিয়ে সে কেঁদে পড়ল— বাপু, তোমার মনে পড়ে, বলেছিলে এ পথ তুমি চিনলে কি করে? যেদিন আমি বনহুরকে ধরার জন্য কান্দাই বনে যাই? মনে পড়ে বাঁশীর সুরে আমি যখন বনহুরকে ঘর থেকে বের করে আনি তখন বলেছিলে–ওর সংগে তোমার বাঁশীর সুরে যোগাযোগ হলো কি করে? আমি বলেছিলাম বলব পরে।

হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বেটি, বলেছিলে। কিন্তু কি কথা তা তো আজও বলনি?

বাপু, শোন আজ বলছি। আমি দস্যু দুহিতা, বনহুর আমার স্বামী!

স্বামী! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল। তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে নূরীর মুখের দিকে। তারপর বললো—এ কথা আগে বলিসনি কেন মা? আমি ওকে পরপুরুষ জেনে তোকে মিথ্যাবাদী ঠাউরিয়েছি। আর তাই তো ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারার আয়োজন করেছি।

নূরীর মনের আকাশ মুহূর্তে মেঘমুক্ত হয়ে গেল। গভীর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল–বাপু, রঘুই আমাকে গোপনে ওর অনুচর দ্বারা চুরি করে অজানা একটা দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিল এবং আমার ইজ্জত নষ্ট করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে রঘু গুহায় প্রবেশ করল—সর্দার, বনহুরকে তার আসনে আনা হয়েছে।

ভীম সেন তাকাল রঘুর মুখে।

রঘু দেখল নূরী ভীম সেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

ভীম সেন বলল—হয়েছে?

হাঁ সর্দার, হয়েছে। এখন আপনি গেলেই শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

ভীম সেন হঠাৎ হেসে উঠল ভীষণভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ, চমৎকার। চল তাহলে।

ভীম সেন এগুলো, পাশে চলল রঘু।

নূরী পেছনে।

ভীম সেনের হাসির শব্দে নূরীর হৃৎপিণ্ড থরথর করে কেঁপে উঠল। একটু পূর্বে তার হৃদয়ে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠেছিল, দপ করে তা নিবে গেল নিমেষে।

শিথিল পা দুখানা টেনে নিয়ে নূরী এসে দাঁড়লে ভীম সেনের পাশে। তাকাল সামনে।

উঁচু একটা বেদীর মত জায়গায় বনহুরকে শিকল দিয়ে দু'হাত দুটো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। পা দুটোও বাঁধা হয়েছে শিকলে। তার চারপাশে স্তূপাকার শুকনো কাঠ আর ডালপালা।

একজন ভীষণ চেহারার লোক জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আদেশের প্রতীক্ষা মাত্র।

নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

বনহুর তাকিয়ে আছে নূরীর দিকে।

নূরী কাঁদছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন পাথরের মত। এতটুকু বিচলিত হয়নি বা ঘাবড়ে যায়নি সে। মৃত্যু যখন একদিন হবেই তখন এতে ঘাবড়াবার কি আছে! কিন্তু মরার সময় মা, মনিরা এদের সঙ্গে দেখা হলো না এই যা দুঃখ।

এখানে যখন বনহুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে, তখন কান্দাই শহরে চৌধুরীবাড়ির একটা কক্ষে মরিয়ম বেগম নামাযান্তে দু'হাত তুলে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে খোদার নিকটে দোয়া প্রার্থনা করছিল। দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর অশ্রুধারা।

মরিয়ম বেগমের দোয়া খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছল। তিনি মায়ের দোয়া মঞ্জুর করলেন।

ভীম সেন কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল—বনহুরকে মুক্তি দাও। রঘুকে বন্দী কর।

সঙ্গে সঙ্গে একদল অনুচর রঘুকে ঘিরে ফেলল।

অপর দল বনহুরের শিকল খুলে দিতে লাগল।

রঘু এ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে আনন্দিত মনে প্রতীক্ষা করছিল, বনহুরের অগ্নিদগ্ধ দেহটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নূরীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হবে। কিন্তু সব আশা তার মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

শিকলে আবদ্ধ হলো রঘু।

বনহুরের স্থানে রঘুকে মজবুত করে বাঁধা হলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা। রাতের অন্ধকার আলোয় গোটা বন আলোময় হয়ে উঠল।

গনগনে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থেকে ভেসে এলো রঘুর আর্তচিৎকার—মরে গেলাম! জ্বলে গেল। জ্বলে গেল। মরলাম....মরলাম...

ভীম সেন অট্টহাসি হেসে উঠল—নারীহরণকারীর জ্বলে মরাই উচিত সাজা।

নূরী ছুটে গিয়ে বনহুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল।
ভীম সেন আনন্দের হাসি হাসল।
বনহুর এবার বিদায় চাইল ভীম সেনের কাছে।
ভীম সেন বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় দিল।

❑

মন্দিরা নদীর বুকে নৌকা ভাসল। বনহুর আর নূরী পাশাপাশি বসে হাত নাড়ছে, ওদের মাঝখানে মনি। সেও ছোট্ট হাত নেড়ে ভীম সেন এবং তার দলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

ধীরে ধীরে ভীম সেনের দলসহ নদীতীর অদৃশ্য হলো।

নূরী মনিকে তুলে নিল বুকে।

বনহুর হাসল।

নূরী তাকিয়ে দেখল বনহুরের মুখের দিকে। অপূর্ব সে হাসি। বনহুরের দীপ্ত মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতার ছাপ।

নদীবুকে দুলে দুলে নৌকা এগিয়ে চলেছে।

বনহুরের বুকে মাথা রেখে নূরী শুয়ে আছে। পাশে ঘুমন্ত মনি!

বনহুর নূরীর চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

নিস্তব্ধ রাত।

জোস্নাভরা আকাশ।

নদীর জলে জোস্নার আলো অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। ঝুপঝাপ দাঁড়ের শব্দের সঙ্গে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মিশে একটানা সংগীতের মত মনে হচ্ছে।

নৌকা বেয়ে চলছে ভীম সেনের দু'জন অনুচর।

আকাশের দক্ষিণ কোণে ভেসে ওঠে একখণ্ড কাল মেঘ।

বনহুর আর নূরী তা টের পায় না। ওরা তখন নৌকার মধ্যে আপ কথায় মগ্ন। বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে হাতের তালুতে—নূরী, আজ আমার জয়যাত্রা।

নূরী সোজা হয়ে বসল, হেসে বলল–তোমার নয় আমার, এ জয়যাত্রা আমার।

উঁহু, আমার নূরী। কারণ আমি তোমাকে জয় করে নিয়ে চলেছি।

না, আমি তোমায় জয় করে নিয়েছি, হুর!

দু'জনই হেসে উঠল উচ্ছ্বসিতভাবে।

নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল—নূরী, তুমি কোন দিন সিনেমা দেখেছ?

সে কি রকম জিনিস?

ছায়াছবি। ছবি কথা বলে, গান গায়, হাসে, কাঁদে....

সত্যি?

হ্যাঁ, জীবন-কাহিনী নিয়ে তৈরি হয় এই ছায়াছবি।

আশ্চর্য!

নূরী, জান ছবির প্রধান চরিত্র হলো ছবির নায়ক-নায়িকা। একজন নায়িকা, হয়তো তার বিপরীতে থাকে দু'জন নায়ক। দু'জনই ভালবাসে একজনকে। কিন্তু আসল নায়ক হলো একজন, দ্বিতীয় জন ভিলেন বা আসল নায়কের ভালবাসায় বাধা প্রদানকারী।

নূরী অত্যন্ত মনোযাগের সঙ্গে বনহুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। বলল—হ্যাঁ বুঝলাম।

বনহুর বলে চলে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিলেনের পরাজয় হয়–হয় মৃত্যু, নয় মতের পরিবর্তন। এক নায়িকার দুই নায়ক থাকতে পারে না কোনদিন।

হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—অসম্ভব।

বনহুর মৃদু হেসে বলল—আর এক নায়কের যদি দুই নায়িকা হয়?

তাও অসম্ভব! একটি প্রাণ কোনদিন দু'জনের হয় না। কিন্তু এসব তুমি আমায় বলছ কেন হুর?

নূরী, তুমি জান আমি মনিরাকে বিয়ে করেছি।

মুহূর্তে নূরীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। যদিও নূরী এ কথা জানে তবু বনহুরের মুখে কথাটা শুনে হৃদয়টা খান খান হয়ে গেল ওর। ব্যথায় মুচড়ে উঠল ভেতরটা। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অন্য দিকে।

আকাশে তখন মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে।

মাঝিদের মনে আশঙ্কা জাগল। তবু দাঁড় টেনে চলেছে তারা দ্রুত হস্তে। চাঁদ এখনও সম্পূর্ণ মেঘের নিচে ঢাকা পড়ে যায়নি। তাই জোছনার আলো নদীবক্ষে ঝিকমিক করছিল।

নৌকার মধ্যে নূরী আর বনহুর টের পায়নি কিছু।

বনহুর বুঝল এবং জানে, মনিরাকে নূরী সহ্য করতে পারে না—মনিরাও সহ্য করতে পারে না নূরীকে। কিন্তু উভয়ে গভীরভাবে ভালবাসে একজনকে—সে হলো বনহুর নিজে।

এমন অবস্থায় বনহুরের কি কর্তব্য? বনহুর নিজের মনে বিচার করে দেখেছে, সে উভয়কেই ভালবাসে। নূরী ছাড়া বনহুর ভাবতে পারে না। মনিরাকে, মনিরাকে বাদ দিয়েও নূরীকে ভাবতে পারে না। এই দুই নারীর প্রেম ভালবাসা-মমতা বনহুরকে সমানভাবে দখল করে বসেছে।

বনহুর জানে, পৃথিবীতে একজন–একজনকেই মনপ্রাণ সব দিতে পারে, দু'জনকে নয়। কিন্তু তার অবস্থা পৃথিবীর সকলের চেয়ে অন্য রকম। মনিরা আর নূরী বনহুরের কাছে সমান বলে মনে হয়।

মনিরা বনহুরের হৃদয়ে জাগায় শিহরণ, নূরী জাগায় স্পন্দন। মনিরার মধ্যে বনহুর রচনা করে খুশির উৎস। মনিরা তার হৃদয়ের রাণী আর নূরী তার প্রাণ প্রতিমা। কাউকে বনহুর তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করতে পারে না। আজ তাই বনহুর নূরীকে হঠাৎ এই প্রশ্ন করে বসল।

বনহুর নূরীর চিবুকটা ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে, শান্তকণ্ঠে বলল—কি হলো নূরী?

কিছু না।

কিন্তু পৃথিবীতে যা না হয়েছে আমি তাই চাই নূরী। আমি চাই তোমাদের দু'জনকে।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—তা কি সম্ভব?

নূরী, যা সম্ভব নয় আমি তাই চাই----গভীর আবেগে নূরীকে কাছে টেনে নেয় বনহুর।

মনি এমন সময় নড়ে ওঠে।

নূরী বলে—ছিঃ মনি জেগে যাবে যে?

ঠিক সেই মুহূর্তে মাঝির কণ্ঠে শোনা গেল ভয়ার্ত স্বর–হুজুর, ঝড় আইবো। আকাশে দারুণ মেঘ অইছে।

বনহুর আর নূরী ছৈয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। গাঢ় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। বনহুরের আর একটা দিনের কথা বিদ্যুতের মত খেলে গেল মনের আকাশে। এমনি সেদিনও সে দাঁড়িয়ে ছিল পিতার পাশে, আকাশে ঘন মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছিল। পরক্ষণেই ঝড়-বৃষ্টি তুফান--তারপর সব ওলোট পালট হয়ে গিয়েছিল, এমন কি তার জীবনটাও।

বনহুর আজ সেই ছোট্ট বালকটি নেই, আজ সে বলিষ্ঠ যুবক।

বনহুর দ্রুত নিজে গিয়ে দাঁড় তুলে নিল হাতে। নূরীকে লক্ষ্য করে বলল–শিগগির ভেতরে যাও নূরী, মনিকে কোলে নিয়ে বস।

আর তুমি?

আমি দেখি নৌকাটাকে বাঁচাতে পারি কিনা---বনহুরের কথা আর শোনা যায় না ঝড়ো হাওয়ায়। নূরী গিয়ে ঘুমন্ত মনিকে তুলে নেয় কোলে।

ঝড়ের দাপটে নৌকাখানা দোলনার মত দুলতে লাগল। দু'জন মাঝি আর বনহুর নিজে নৌকাখানা বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

বৃষ্টির পানি আর উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের পানিতে বনহুরের সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গেল। বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় ঠিক রেখে নৌকাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাপটায় বনহুর নৌকার গলুই থেকে ছিটকে পড়ল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানা একটা ঘুরপাক খেয়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল লক্ষ্যহীনভাবে!

❑

একদল সখী পরিবেষ্ঠিত রাজকুমারী হীরাবাঈ গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফিরছিল। খুব ভোরে রোজ হীরাবাঈ সখীদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে আসে। অপূর্ব সুন্দরী হীরা বেলা ওঠার পূর্বে রাজপথ বেয়ে গঙ্গাতীরে যায়। আবার লোক জাগার পূর্বেই রাজপুরীতে ফিরে আসে। যতক্ষণ হীরা রাজপথ দিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে না যায় ততক্ষণ নগরীর দোকানপাট বা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

সাত ঘোড়ার গাড়িতে হীরাবাঈ সাত সখী পরিবেষ্ঠিত হয়ে গঙ্গাতীরে স্নানে আসে। এমন কি ঘোড়াগাড়ি চালক পর্যন্ত নারী। হীরাবাঈ বাল্যবিধবা, ব্রাহ্মণ-কন্যা। রাজা নারায়ণ দেব অতি নিষ্ঠাবান রাজা। কন্যা বিধবা হলেও তার কোন স্বাদ-আহলাদ থেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। যা হীরাবাঈ ভালবাসে বা চায়, তাই করেন রাজা নারায়ণ দেব।

প্রতিদিনের মত আজও হীরাবাঈ সাত সখী নিয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে বাড়ি ফেরার জন্য গঙ্গাতীর বেয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

হঠাৎ হীরাবাঈয়ের দৃষ্টি চলে যায় অদূরে, সে দেখল বালুচরে পড়ে রয়েছে একটি লোক। সংগিনীদের দেখিয়ে বলল হীরা—দেখ্ দেখ্ ও কে পড়ে আছে!

হীরা সখীদের নিয়ে অগ্রসর হলো।

নিকটে পৌছে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো হীরা। সখীরাও কম আশ্চর্য হলো না। অপূর্ব সুন্দর এক যুবক অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে বালুচরে।

হীরা পুরুষ মানুষ তেমন করে কোনদিন দেখেনি। যদিও দেখেছে দূরে, এত কাছে একমাত্র পিতাকে ছাড়া কাউকে দেখার সুযোগ তার কোনদিন হয়নি।

হীরা অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল যুবকের মুখের দিকে।

সখীরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল । হীরা বাল্যবিধবা, কোন পুরুষ দেখা তার পাপ। সখীরাও যুবকের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

হীরা বসে পড়ল যুবকের পাশে। তাড়াতাড়ি বুকে কান রেখে বলল–পারুল এ জীবিত!

পারুল বলল—হয়ত কোন নৌকাডুবি লোক।

হীরা ব্যস্তকণ্ঠে বলল—একে নিয়ে চল পারুল ।

সর্বনাশ, মহারাজ যদি জানতে পারেন?

আমি ওকে কিছুতেই এখানে রেখে যাব না পারুল, ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্। নিশ্চয়ই কোন রাজকুমার হবে।

একজন সখী বলল—কিন্তু পোশাক তো রাজকুমারের মত নয়। দেখছ না জামা ছেঁড়া।

অন্য একজন সখী বলল—সত্যি, এ অপূর্ব সুন্দর কিন্তু।

আর একজন বলল—দেবকুমারের মত দেখতে।

পারুল বলল–আমার হীরার সংগে সুন্দর মানত যদি সে বিধবা না হত------

হীরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল—ন্যাকামি রাখ্ দেখি। আহা বেচারী না জানি কে, কি এর পরিচয়!

পারুল হেসে বলল—জ্ঞান ফিরলেই সব জানা যাবে।

হীরা বলল—তাড়াতাড়ি তুলে নে আমার গাড়িতে।

সবাই মিলে যুবকের সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিল গাড়িতে।

জ্ঞান ফিরতেই চোখ মেলে তাকাল বনহুর।

একি! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। দুগ্ধ-ফেনিল শুভ্র বিছানায় নরম তুলতুলে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। বনহুর ধীরে ধীরে তাকাল কক্ষের চারদিকে। সুন্দর করে সাজান কক্ষটি। নানা রকমের বিচিত্রময় কারুকার্যখচিত দেয়াল। বড় বড় ঝাড়বাতি আর মূল্যবান লণ্ঠন ঝুলছে। যে খাটে শুয়ে রয়েছে সে খাটখানা অতি সুন্দরভাবে তৈরি। খাটের সংগে মখমলের ঝালর টাঙানো রয়েছে। খাটের পাশে গোল মার্বেল পাথরের টেবিল। টেবিলে মস্তবড় একটা ফুলদানি। ফুলদানিতে অনেকগুলো ফুল গোঁজা রয়েছে।

বনহুর এবার বিছানায় উঠে বসল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। পাশের একটা লম্বা সোফায় অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী নিদ্রামগ্ন। গোলাপের পাপড়ির মত মুদিত দুটি আঁখিযুগল। আপেলের মত গণ্ডদ্বয়। বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত যুবতীর মুখের দিকে।

একি সে স্বপ্ন দেখছে! বনহুর স্মরণ করতে চেষ্টা করল এখন সে কোথায়?–মনে পড়ল সব কথা। নৌকা থেকে নবীবক্ষে ছিটকে পড়ার দৃশ্য ভেসে উঠল তার মানসপটে। মনে পড়ল নূরী আর মনির কথা। না জানি তাদের অবস্থা কি হয়েছে। হয়ত সলিল সমাধি লাভ করেছে ওরা। ব্যাথায় টনটন করে উঠল বনহুরের মন।

কিন্তু এখানে এলো সে কি করে!

নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কখন তার হাত দু'খানা অবশ হয়ে এসেছিল, তারপর কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল নেই কিছু।

বনহুর নিজেকে এই সুসজ্জিত রাজকক্ষে দেখে অনুমানে কিছুটা বুঝে নিল। কিন্তু এটা কোন দেশ, কে এই যুবতী, তাকে কি করেই বা এখানে

আনল। ইচ্ছা করলে এখনই বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু না জেনে হঠাৎ এমনভাবে বাইরে বের হওয়া এখন তার পক্ষে উচিত হবে না।

বনহুর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, রাজবাড়িই বটে। ফিরে এলো সে ঘুমন্ত যুবতীর পাশে, ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল সত্যি—অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। নিশ্চয়ই রাজকন্যা হবে। কিন্তু সে রাজকন্যার শয়ন কক্ষে এবং বিছানায় শায়িত কেন? মোমবাতি নিয়ে বনহুর হীরার মুখটা ভাল করে দেখতে লাগল!

হঠাৎ এক ফোঁটা তপ্ত মোম ঝরে পড়ল হীরার গণ্ডে।

চমকে জেগে উঠল হীরাবাঈ। চোখ মেলতেই দেখল সেই যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ হাতে তার মোমবাতি।

বনহুর তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল; হীরা পিছু ডাকল শোন ।

থমকে দাঁড়িয়ে বনহুর ফিরে তাকাল।

হীরা মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এলো তার পাশে। বললো—যুবক, কে তুমি? কেমন করে নদীতীরে এসেছিলে?

বনহুর বুঝতে পারল—সে মন্দিরা নদী থেকে প্রবল ঝড়ের দাপটে ঢেউয়ের আঘাতে কোন অজানা দেশে এসে পড়েছে। নদীতীরে হয়ত পড়েছিল সে, এরা তাকে তুলে এনেছে। কিন্তু এ যুবতীর কক্ষে কেন?

হীরা পুনরায় প্রশ্ন করল —কি ভাবছো যুবক? আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন?

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল—আমি বনহুর।

হীরা বনহুরের কথাটা পুনরাবৃত্তি করল—বনহুর! তারপর বলল—কোন দেশের রাজকুমার তুমি?

আমি রাজকুমার নই।

তবে কে তুমি?

আমি দস্যু।

দস্যু! ডাকু তুমি?

হাঁ, কিন্তু তুমি?

হীরাবাঈ। আমার বাবা নারায়ণ দেব সিন্ধু রাজ্যের মহারাজ।

হুঁ, রাজকুমারী হীরাবাঈ। কথাটা আপন মনেই বলল বনহুর। একটু থেমে বলল সে—আমাকে নদীতীর থেকে কুড়িয়ে এনে ভাল করনি হীরাবাঈ।

কেন?

আমি তোমার সব অলঙ্কার লুটে নিতে পারি।

তুমি আমার সাথে অন্যায় করবে?

করব না, কারণ তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। বনহুর সরে এলো হীরাবাঈয়ের পাশে—আমাকে চলে যাবার পথ দেখিয়ে দাও এবার।

চলে যাবে?

হাসল বনহুর—না গিয়ে কি পারি?

তুমি চিরদিন এখানে থাকতে পার না?

বনহুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে।

হীরা দৃষ্টি নত করে নিল।

বনহুর দেখল, হীরাবাঈয়ের মুখমণ্ডলে একটা অব্যক্ত ব্যথার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারছে না।

বনহুর এসে বসল বিছানার একপাশে, হীরাকে লক্ষ্য করে বলল—এখানে আমাকে কে নিয়ে এসেছে হীরাবাঈ?

হীরা মুখ তুলে তাকাল, এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে—বলল আমি আর আমার সখীগণ।

তোমার বাবা নারায়ণ দেব আমার কথা জানেন না?

না।

সেকি!

হ্যাঁ, আমার বাবা তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না ।

কেন, তোমরা তাঁকে বলোনি আমার কথা?

না না, আমার বাবা তোমার কথা জানতে পারলে আর কোনদিন তোমাকে আমার কাছে আসতে দেবেন না।

বনহুর হীরাবাঈয়ের কথা যতই শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তাই বনহুর প্রশ্ন করে—কেন?

হীরা এবার বসল বনহুরের পাশে, বলল—পুরুষলোক আমার দেখা মানা।

মানা!

হ্যাঁ, কারণ আমি বিধবা।

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুর—তুমি বিধবা! কিন্তু তোমার বয়স তো তেমন বেশি বলে মনে হচ্ছে না হীরাবাঈ?

আমি বাল্যবিধবা। খুব ছোট্টবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি স্বামীকে চিনার আগেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

সে কারণে পুরুষলোক দেখা তোমার মানা?

ব্রাহ্মণ বিধবা আমি, কাজেই আমার কোনদিন-----চুপ হয়ে যায় হীরাবাঈ।

বনহুর এবার সব বুঝতে পারে। করুণাভরা নয়নে তাকাল ওর মুখের দিকে। হীরার কথাগুলো তার হৃদয়ে আঘাত করল। বনহুর জানত

হিন্দুঘরের বিধবা মেয়েদের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, বেদনাদায়ক। কিন্তু চাক্ষুষ দেখার বা অনুভব করার সুযোগ এই তার প্রথম।

বনহুর হীরাঈবায়ের অপরূপ সৌন্দর্যভরা যৌবন ঢলঢল চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এর জীবনটা কি তাহলে এমনিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। ফুল ফুটে নীরবে যদি ঝরে যায়, কেউ যদি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে না পারে, তবে সে ফুলের জীবনে সার্থকথা কি?

বনহুর আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হীরার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চোখ তুলে তাকায়।

হীরা বলে ওঠে—তোমাকে কোনদিন যেতে দেব না।

একটুকরা ম্লান হাসি ফুটে উঠল বনহুরের ঠোঁটের কোণে। কোন জবাব দিল না সে।

পূর্বাকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে।

সাত সখী প্রবেশ করল কক্ষে। বনহুর ও হীরাবাঈকে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

হীরাবাঈ হেসে বলল— ভয় নেই, ওরা আমার সখী।

বনহুর ভয় পাবে নারীদের দেখে। তবু চোখেমুখে ভীতিভাব এনে বলল—বাঁচলাম।

একসঙ্গে সখীগণ হেসে উঠল।

হীরা বলল—ওদের সাহায্যেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি।

ও, তাই বল। তুমি একা নও।

আমি কি পারি তোমার ওই বলিষ্ঠ দেহটা একা তুলতে। আচ্ছা তুমি আমার এই কক্ষে থাক, আমি গঙ্গাস্নান করে আসি।

সখীদের মধ্য থেকে পারুল বলল—এরই মধ্যে খুব যে ভাব জমিয়ে নিয়েছ হীরা, দেখ সাবধান। বাঁকা চোখে একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল সে।

হীরা সখীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

নগরী জাগরিত হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরে আসবে ওরা।

❑

ইচ্ছা থাকলেও বনহুর হীরাবাঈ আর তার সাত সখীর নিকট হতে পালাতে সক্ষম হলো না। বিশেষ করে হীরার চোখের পানি তাকে অভিভূত করে ফেলল। বড় মায়া হলো বনহুরের, চাইল হীরার জীবনটা যেন নষ্ট হয়ে না যায় তাই করতে।

সব সময় বনহুর ভাবতে লাগল—কি করে হীরার জীবন সুখের এবং আনন্দের করা যায়! কিন্তু এ সবের মধ্যেও বারবার বনহুরের মনে নূরী আর মনির কথা উদয় হতে লাগল। সেই মন্দিনা নদী থেকে এদেশ কত দূরে। কত দুরে সেই কান্দাই নগর, যেখানে তার মা আর মনিরা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। নূরী আর মনির জন্যই বনহুরের মন বেশি বেদনাবিধুর হয়ে পরেছে। ইচ্ছা করলে এখনই সে চলে যেতে পারে কিন্তু হীরা—হীরাকে এমনভাবে ফেলে মন তার যেতে চাইল না।

বনহুর যখন হীরাবাঈয়ের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করছে, হীরা তখন বনহুরকে কেন্দ্র করে রচনা করে চলেছে স্বপ্নসৌধ।

হীরা বাগানের ফোয়ারার পাশে বসে বীণা বাজাচ্ছিল। আর ভাবছিল বনহুরের কথা। ওকে আর কোনদিন ছেড়ে দেবে না হীরা। হোক সে বাল্যবিধবা, মানবে না ওসব কিছু। গোপনে বনহুরকে সে লুকিয়ে রাখবে নিজের অন্তঃপুরে, যেখানে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কেউ জানবে না ওর কথা।

হীরা মাঝে মাঝে পারুলের কাছে মনের কথা সব খুলে বলত। আজ পারুল এসে বসল হীরার পাশে। ওকে চমকে দেবার জন্য পেছন থেকে হীরার চোখ দুটি চেপে ধরল।

হীরার হাতে বীণার সুর থেমে গেল।

হীরা চমকে উঠলো, বনহুরের চিন্তায় হীরা তন্ময় ছিল, কাজেই সে চট করে বলল তুমি?

পারুল হীরার চোখ ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হীরা লজ্জিত কণ্ঠে বলল—ও তুই?

দু'সখী মিলে যখন কথা হচ্ছিল, অদূরে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল বনহুর। যেখান থেকে হীরা আর পারুলের কথা সব শুনতে পাবে।

পারুল বসে পড়ল হীরার পাশে, হীরার গালে টোকা দিয়ে বলল—সব সময় তার ধ্যানেই মগ্ন থাকবি?

পারুল!

হীরা, আমি সব জানি।

আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না পারুল।

কিন্তু তুমি যে হিন্দু ঘরের বিধবা----

পারুল! চিৎকার করে ওঠে হীরা।

পারুল বলে—কিন্তু জান এর পরিণতি কি হবে?

বাবা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

হ্যাঁ, তিনি যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাজা—তোমার জন্য তিনি নিষ্ঠা নষ্ট করবেন না। সমাজের তিনি অধিপতি–

পারুল, সমাজের জন্য, নিষ্ঠার জন্য আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? আমার কি কাউকে ভালবাসার অধিকারটুকু নেই?

না হীরা। তুমি তো জান, তোমার মাসিমা দেবীকা বাঈ তাঁর মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণেও গিয়েছিলেন।

আমাকে তাহলে তখন স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে না মেরে জীবিত রেখেছিল কেন? না, না, আমি বাঁচতে চাই না পারুল, আমি বাঁচতে চাই না----পারুলের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হীরা বাঈ।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে অধর দংশন করে। অব্যক্ত একটা ব্যথা তার মনে চাড়া দিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে ভাবে হিন্দু সমাজের টুটি ছিঁড়ে ফেলবে সে। হীরাকে বিয়ে দিয়ে নিষ্ঠাবান রাজার দর্প চূর্ণ করবে কিন্তু পাত্র কোথায়?

সেদিন হীরা সখীদেরকে নিয়ে বনহুরকে নাচ দেখাচ্ছিল। একটা আসনে বনহুর বসে ছিল, হীরা আর তার সখীগণ নেচে চলেছে।

বনহুর তন্ময় হয়ে দেখছে, হীরা অপূর্ব সুন্দর নাচছে।

হীরা এত সুন্দর নাচতে পারে, ভাবতেও পারেনি বনহুর।

সেদিন হীরার বীণার সুর তাকে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিল।

বনহুর ভাবে, এত সুন্দর একটা জীবন নীরবে শুকিয়ে যাবে, তা হয় না।

নাচা শেষ হলে সখীরা চলে যায়।

হীরা তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। হীরার মুখে ঘামের বিন্দুগুলো ঠিক যেন মুক্তার মত চক চক করছিল। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।

বনহুর সরে আসে হীরার পাশে। মধুর কণ্ঠে ডাকে—হীরাবাঈ।

হীরা গম্ভীর হয়ে বলে—উঁহু, শুধু হীরা বলে ডেক।

বেশ, তাই ডাকব। হীরা, অপূর্ব নেচেছ!

উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে হীরা—সত্যি!

হ্যাঁ হীরা!

হীরা আবেগমাখা কণ্ঠে বলল—বনহুর!

হীরা!

বল?

সেদিন পারুলকে তুমি যা বলেছ সব শুনেছি।

চমকে উঠল হীরা—শুনেছ?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যা বলছ তা সম্ভব নয়। আমি মুসলমান।

হীরা একবার তাকাল বনহুরের দিকে, তারপর বলল—কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি!

ভাল আমিও তোমাকে বেসেছি হীরা।

বনহুর!

হাঁ, তোমাকে আমি বোনের মত স্নেহ করি।

চমকে তাকাল হীরা, অস্ফুট কণ্ঠে বলল–তুমি----তুমি---

হীরা, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে,--- এমনকি একটি সন্তানও—কথা শেষ না করে থেমে যায় বনহুর।

হীরা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর হীরার চোখের পানি নিজের আংগুলে মুছে দিল।

হীরা আবেগভরা কণ্ঠে বলল—এ তুমি কি করলে? সঙ্গে সঙ্গে হীরা ঢলে পড়ল মেঝেতে।

বনহুর তাড়াতাড়ি হীরার মূর্চ্ছিত দেহটা ধরে ফেললো দু'হাত দিয়ে। তারপর তুলে নিল হাতের উপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে পারুল এসে দাঁড়াল—একি! ওকে আপনি স্পর্শ করলেন?

বনহুর একটু হকচকিয়ে গেল, বলল—হঠাৎ হীরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

কিন্তু জানেন তো, আমাদের জাতের মধ্যে যে পুরুষ একবার কোনো নারীকে স্পর্শ করে তাকেই বিয়ে করতে হয়।

বনহুর হাসল—চল আগে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

পারুল আর বনহুর হীরার সংজ্ঞাহীন দেহটা এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

পারুল হীরার চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিতে দিতে বলল—একি করলেন! একি করলেন আপনি?

আমি------আমি তো কিছু করিনি।

কথা দিন ওকে বিয়ে করবেন?

সে কথা তোমার সখীর সংগে হয়ে গেছে পারুল।

ও, তাই বুঝি হীরা আনন্দে....

হাঁ, আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আচ্ছা পারুল, তুমি সখীর পাশে বসে সেবা কর, আমি পাশের কক্ষে বিশ্রাম করছি।

তা হয় না, অপনি বরং বসুন, আপনার জন্যই বেচারীর এ অবস্থা।

কিন্তু আমার যে বড্ড ঘুম পাচ্ছে। —বনহুর চট করে উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। তারপর খিল এঁটে দিল।

বনহুর সম্মুখ দরজায় খিল দিয়ে পেছনের জানালার কাঁচ খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে একটা চাকু সংগ্রহ করে নিল বনহুর। তারপর কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

ছাদের রেলিং বেয়ে অতি কষ্টে এগুতে লাগল মহারাজার কক্ষের দিকে।

বনহুর মহারাজের কক্ষের নিকটে এসে পৌঁছল। এবার অতি সহজে তাঁর কক্ষের মুক্ত জানালাপথে ভেতরে প্রবেশ করল। কক্ষে প্রবেশ করেই দেয়ালে টাঙানো সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা তুলে নিল দক্ষিণ হাতের মুঠোয়। পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখে বাঁধল যেমন দস্যুরা বাঁধে।

বনহুর এবার সুতীক্ষ্ণ ছোরা হাতে মহারাজ নারায়ণ দেবের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। একটানে তাঁর শরীরের চাদর সরিয়ে দিল সে।

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন রাজা নারায়ণ দেব। সম্মুখে তাকিয়ে চোখ তাঁর ছানাবড়া হলো। ঢোক গিলে বললেন— কে তুমি? কি চাও?

আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! কি চাও আমার কাছে? যা চাইবে তাই দেব। শুনেছি কান্দাই জঙ্গলে দস্যু বনহুর বলে এক ভয়ঙ্কর দস্যু আছে, সেই দস্যু তুমি?

হাঁ, আমিই।

আরও শুনেছি, দস্যু বনহুর নাকি ভয়ঙ্কর হলেও দয়ার প্রতীক। দীন-হীন জনের বন্ধু। বহুদিনের আশা আমার সফল হলো। মনে মনে বহুদিন তোমাকে দেখার বাসনা আমার মনে উঁকি দিত। দস্যু হলেও তুমি দেবতার সমান---

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বনহুর—মায়াভরা কথাতে দস্যু বনহুরের হৃদয় কোমল হয় না মহারাজ।

তুমি যাই বল, তুমি আমারও বন্ধু-- কারণ, আমি চাই আমার দ্বীন-হীন প্রজাদের মঙ্গল, আমার অনাথ মা বোনদের শান্তি—

এবার বনহুর ছোরাখানা মহারাজ নারায়ণ দেবের বুকের কাছে চেপে ধরল— তোমার নিজের ঘরের দিকে দেখেছ রাজা?

দেখেছি, ও অর্থ আমার নয়। সব আমার প্রজাদের---

সে কথা বলছি না, বলছি—তুমি মা-বোনদের শান্তি চাও?

চাই—শতবার চাই।

তোমার কন্যার মনের দিকে তাকিয়ে একবার দেখেছ রাজা?

চমকে ওঠেন মহারাজ নারায়ণ দেব—আমার কন্যা?

হাঁ, তোমার কন্যা হীরাবাঈ।

চঞ্চলকণ্ঠে বলে উঠলেন মহারাজ—হীরা! আমার হীরার কি হয়েছে দস্যু?

তোমার যদি এতটুকু বিবেক থাকত রাজা, তাহলে নিজের কন্যাকে টুটি টিপে হত্যা করতে না।

হত্যা! আমার হীরাকে হত্যা করেছি টুটি টিপে?

তা নয় তো কি? শিশুকালে তাকে বিয়ে দিয়ে বৈধব্য যন্ত্রণা তার ঘাড়ে চাপিয়ে তিলে তিলে তাকে হত্যা করছ।

একি বলছ? তার অদৃষ্টে যা ছিল তা ঘটেছে।

অদৃষ্টে ছিল না—তুমিই তার জীবনটাকে বিনষ্ট করে দিয়েছ। তার চিরদিনের স্বাদ আহ্লাদ সব, তুমি নষ্ট করে দিয়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছ।

হাঁ, আমরা যে ব্রাহ্মণ, আমাদের ধর্মে মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়।

স্বামীকে যে কোনদিন দেখেনি, স্বামী কি জিনিস যে বুঝেনি তার আবার বিয়ে? হাঃ হাঃ হাঃ এই তোমাদের হিন্দুধর্ম! বল রাজা, তোমার কন্যা হীরার আবার বিয়ে দেবে না মৃত্যুবরণ করে নেবে—কোনটায় তুমি রাজী?

তা হয় না। আমাদের হিন্দুমতে ব্রাহ্মণকন্যার পুনঃবিবাহ হয় না।

হতে হবে--নইলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তুমি যত টাকা চাও নিয়ে যাও দস্যু। তবু আমার নিষ্ঠা ভঙ্গ কর না।

তোমার কন্যার জীবনের বিনিময়ে তুমি আমাকে অর্থ দিতে চাও, নিজের জীবনের বিনিময়ে নয়?

আমি নিরুপায়।

না, তোমাকে হীরার বিয়ে দিতেই হবে।

কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে? বিধবাকে কে বিয়ে করবে বল?

আমি তোমার কন্যার পাত্র খুঁজে দেব। বল রাজী?

রাজী।

তিন বার বল রাজী, তিন সত্য করে বল।

রাজী। রাজী। রাজী।

বনহুর যেমন আচম্বিতে এসেছিল তেমনি মুহূর্তে জানালাপথে অদৃশ্য হলো।

পরদিন মহারাজ নারায়ণ দেব রাজসভায় গেলেন না। কোন পরিষদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেন না। রাজকার্য করলেন না। রাজকর্মচারিগণ বিস্মিত হলেন। আত্মীয়-স্বজন দুশ্চিন্তায় পড়ল, মহারাজের হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে কি হলো।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন মহারাজ। সদা চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে তার বিধবা কন্যাকে আবার বিবাহ দেবেন। সমাজে তাঁর মাথা হেট হয়ে যাবে। নিষ্ঠাভঙ্গ হবে। সবাই ছিঃ ছিঃ করবে। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

বনহুর সেই দিনের পর থেকে সিন্ধু রাজ্যে প্রতি ঘরে ঘরে পাত্র খোঁজ করে চলল। হীরার পাত্র সুন্দর, সুপুরুষ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং কুলীন ব্রাহ্মণ হতে হবে।

পেয়েও গেল সে একদিন।

পাশের রাজ্যে ব্রাহ্মণ তরুণ রাজা জহর সেনকে আবিষ্কার করল বনহুর।

তারপর একদিন গোপনে হীরার ছবি নিয়ে রাজা জহর সেনের রাজসভায় বৃদ্ধ জ্যোতিষীর বেশে গিয়ে হাজির হলো।

রাজা জহর সেন যেমন সুন্দর তেমনি হৃদয়বান এবং মহৎ। সে জ্যোতিষীকে আদর করে নিজের পাশে বসাল।

বনহুর জ্যোতিষীর বেশে নিজকে আসনে প্রতিষ্ঠা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল— মহারাজা আপনার জয় হোক।

সসম্মানে বলল জহর সেন—জ্যোতিষী আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারেন মহারাজ। আমি এসেছি একটি শুভবার্তা নিয়ে।

বলুন জ্যোতিষী।

বনহুর থলের মধ্যে হতে হীরার ফটোখানা বের করে বলল— এই মেয়ে পছন্দ হয়?

কুমার জহর সেন বনহুরের হাত থেকে ফটোখানা নিয়ে দেখতে লাগল। চোখ মুখ মুহূর্তে উজ্জল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখল জহর সেন, তারপর বলল হাঁ, জ্যোতিষী এ মেয়েটি আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে।

সত্যি রাজা?

হাঁ এবং অতি শীঘ্র একে আমি বিয়ে করতে চাই।

বেশ, তাই হবে। উঠে দাঁড়ায় বনহুর।

জহর সেন নিজ কণ্ঠের মুক্তার মালা খুলে জ্যোতিষীর হাতে দিতে যায়—এই নিন আপনার পুরস্কার।

না। শুভ কাজের পর আমি পুরস্কার নেব—আগে নয়। এখন চললাম।

জহর সেন প্রণাম জানায়। জ্যোতিষী বিদায় গ্রহণ করে।

❑

পৃথিবীর বুকে যেন একটা ধ্বংসের লীলা খেলা হয়ে গেছে। গত রাতের ঝড় সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। নূরী শিশু মনিকে নিয়ে নৌকায় বসে আছে। নৌকা আপন মনে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে, কোথায় এর শেষ—কেউ জানে না।

নৌকার মাঝিদ্বয় বনহুরকে উদ্ধারের জন্য নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়েছিল, ফিরে আর আসেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা কে জানে। ঝড় থেমে গেছে। প্রকৃতি শান্ত ধীর স্থির হয়েছে। নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি নিটল নির্মল হয়েছে। কিন্তু এ কোথায় এসে গেছে নূরী আর মনির নৌকা। যেদিকে তাকায় নূরী শুধু জল আর জল। কোথাও তীরের চিহ্ন নেই।

নূরী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। ক্ষুধা পিপাসায় কন্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। মনির তো কথাই নেই। বার বার মনি বলছে— আম্মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নূরী মনিকে বুকে চেপে বলে উঠে— কেমন করে বলব বাবা।

আম্মা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

হু হু করে কেঁদে উঠল নূরীর মন, বলল—কি খাবে বাপ। কিছুই যে নেই।

কিন্তু কতক্ষণ এমনি করে ওকে ভুলিয়ে রাখা যাবে।

গোটা দিন কেটে গেল। রাত এলো—

নূরী আর মনি নৌকার মধ্যে ভেসে চলেছে—দিকহারা, দিশেহারা যাত্রী তারা।

সে রাত গেল, আবার ভোর হলো।

গোটা পৃথিবী সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠল।

নূরী আর মনির নৌকা ভেসে চলেছে।

মনির সুন্দর গোলাপকুড়ির মত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কাঁদতে পারছে না মনি, কণ্ঠ নীরস শুষ্ক।

নূরী হতাশ হয়ে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল আর বুঝি মনিকে সে বাঁচাতে পারল না।

এলিয়ে পড়েছে মনি নূরীর কোলে।

নূরীর চোখ বসে গেছে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। নূরী নিজের এবং মনির জীবনের আশা ত্যাগ করল।

আর নূরীর মনে হলো, মনিকে সে রেখে ভুল করেছে।

কেন যে মনিকে তার বাপ-মার কাছে ফেরত দেয়নি।

তাহলে মনি আজ এমনভাবে শুকিয়ে মরত না। কে এর বাবা-কে এর মা, কার এ শিশু—নূরীর চোখ দিয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হয়ত তখন সন্ধান করলে এর বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই ইচ্ছা থাকলে উপায় হত, কিন্তু নূরীই তা হতে দেয়নি। একটা গভীর স্নেহ তার নারী-হৃদয়ে দানা বেঁধে উঠেছিল।

নৌকা ভেসে চলেছে।

নূরীর কোলে মনি ঘুমন্ত না জাগ্রত বুঝার উপায় নেই। চোখ দুটো মুদে আছে। নূরী মাঝে মাঝে ভাবে মনির মৃতদেহ নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়ে নিজেও নদীবক্ষে ঝাপিয়ে পড়বে, বাস্ সব শেষ হয়ে যাবে।

যেখানে তার হুর গেছে, তার মনি যাবে, সেখানেই হবে নূরীর চিরশান্তি।

নৌকা দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে।

উপরে প্রখর সূর্যের তাপ অগ্নিবর্ষণ করছে।

নিচে সীমাহীন অথৈ জলরাশি—

পরবর্তী বই

বন্দিনী

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই